



Bangali Society For Puja & Culture Inc. (BSPCI) WA, Australia

Pharmacy 777[®] Nollamara



WE PROVIDE *personalised care* TO CREATE MEANINGFUL OUTCOMES FOR *your health*. OUR SERVICES INCLUDE:

- ✓ Sleep apnoea screening, management and support
- ✓ Diabetes management and NDSS supplies
- ✓ Blood pressure checks
- ✓ Asthma management
- ✓ Pain management
- ✓ Weight management
- ✓ Mental health support
- ✓ Private pharmacist consultations
- ✓ Medication reviews
- ✓ Parent's Group
- ✓ Scripts Online and reminders for your prescriptions
- ✓ Free every day Express Delivery in the local area
- ✓ Mobility and home aids for hire
- ✓ Medical certificates
- ✓ Compounding
- ✓ Medication packing (DAA)
- ✓ Disposal of expired medications
- ✓ Flu vaccinations

EVERY DAY 8AM - 10PM
Nollamara Shopping Centre,
84 Hillsborough Drv
Call 08 9349 1570
Email nollamara@pharmacy777.com.au

HERE FOR
YOUR *health*,
FOR *life*.



GUILD
NATIONAL
PHARMACY
OF THE YEAR 2016

www.pharmacy777.com.au 



**Ausbangla
Enterprise**

OPEN 7 DAYS
9:30am - 8:00pm
Thursday
9:30am - 8:30pm

AUSBANGLA ENTERPRISE
**(INDIAN GOURMET
CANNINGTON)**

Cannington Butchers
Fresh Fruits & Vegetables

Shop 4/ 1468 Albany Hwy
CANNINGTON - 9356 3746
ausbanglaenterprise@yahoo.com.au
ausbanglaenterprise.com.au



বন্ধন

BANDHAN

সংকলন ২০২০, দশম সংখ্যা

Magazine 2020, Issue 10

আশ্বিন ১৪২৭,

October 2020

বন্ধন পরিষদ

প্রভাত রায়

শর্মিষ্ঠা সাহা

বিশ্বজিৎ বসু

Bandhan Committee

Provat Roy

Sharmistha Saha

Biswojit Bose

প্রচ্ছদ

প্রভাত রায়

Cover Design

Provat Roy

অঙ্কর বিন্যাস

প্রভাত রায়

Page Makeup

Provat Roy

Acknowledgement

Gautam Sharma

Saumitra Seal

Probir Sarker

Uttam Dewanjee

Debashis Saha

Tanni Chowdhury

Dipok Chandra Sarker

প্রকাশক:

বাঙালি সোসাইটি ফর পূজা এন্ড
কালচার, অস্ট্রেলিয়া।

Publisher:

The Bangali Society for Puja
and Culture (BSPC) Inc.
WA, Australia.

বিঃদ্রঃ লেখকের মতামতের জন্য
সম্পাদক বা প্রকাশক দায়ী নয়।

:: সম্পাদকীয় ::

“যা দেবী সর্ব ভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তুশৈ নমস্তুশৈ নমস্তুশৈ নমো নমঃ ।।
যা দেবী সর্ব ভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তুশৈ নমস্তুশৈ নমস্তুশৈ নমো নমঃ ।।”

প্রতিবছর বাঙালি সনাতন ধর্ম অনুসারীরা মহাসমারহে তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব “শারদীয় দুর্গা পূজা” আয়োজন করে চলেছে। কিন্তু এবারের পরিবেশ বিগত কয়েক দশকের তুলনায় অনেক অর্থেই ভিন্ন। সারা বিশ্বের মানুষ যখন মহামারী করোনা ভাইরাসের ভয়াল আক্রমণে প্রতিনিয়ত মৃত্যু ঝুঁকি নিয়ে নিত্যন্ত দুর্বিষহ জীবন পার করে চলেছে, ঠিক সেই সময়ে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের নিরাময় এবং মঙ্গল কামনার উদ্দেশ্য নিয়ে অনাড়ম্বর পরিবেশে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পার্থবাসীরা এবারের শারদীয় দুর্গা পূজার আয়োজন। নানারকম সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়ে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দ্বারা অনুমোদিত “COVID19 safety guidance” যথাযথভাবে অনুসরণ করার পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতি নিয়ে নিজ ধর্মীয় আচার আচরণ পালন, অনাড়ম্বর পরিবেশে পূজা উৎযাপন, নতুন প্রজন্ম এবং সর্বোপরি সর্বসাধারণের নিকট “শারদীয় দুর্গা পূজা” উৎযাপনের মাহাত্ম্য প্রচারের নিমিত্তে “বাঙালি সোসাইটি ফর পূজা এন্ড কালচার ইনক” (BSPCI) প্রতিবছর থেকে একটু ভিন্নভাবে এবারের পূজা আয়োজন সফল করার জন্য আশ্রয় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারো আমরা মাহের পদতলে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদনের মাধ্যমে বিশ্ব সমাজের শান্তি ও চিরমঙ্গল কামনা করতে মিলিত হব এই দিনে। মাহের আগমন আমাদের যাবতীয় দুঃখ কষ্ট দূর করে সবার জীবনকে শান্তিময় ও কল্যাণকর করবে- এটাই প্রার্থনা। প্রায় এক দশকেরও বেশী সময় ধরে চলে আসা পূজা উৎযাপনের ধারাবাহিকতায় প্রতিবারের মত এবারও “বাঙালি সোসাইটি ফর পূজা এন্ড কালচার ইনক” (BSPCI) অস্ট্রেলিয়ার পার্শে আয়োজন করেছে শারদীয় দুর্গাপূজার। প্রবাসী দুর্গোৎসবের বাড়তি মাত্রা যোগ করতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে স্থায়ী জাতিসত্তাকে তুলে ধরার ধারাবাহিকতায় দশম বারের মত এবারও প্রকাশিত হতে যাচ্ছে ম্যাগাজিন “বন্ধন” যা বর্তমান কালের বাঙালি পার্থবাসীর এই উৎসব আয়োজনেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। “বন্ধন” প্রকাশনার এবারের আয়োজনের সংগে সংশ্লিষ্ট লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, কারিগরি সহায়ক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন। তারা ভবিষ্যতেও এভাবেই বন্ধনের সাথে যুক্ত থাকবেন এই আশা রাখি। এবারের “বন্ধন” প্রকাশনা, উৎসবের বাড়তি মাত্রা যোগ করলেই আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে। এছাড়া প্রকাশনার মত একটি জটিল কর্মযজ্ঞকে সহজতর করতে বটবৃক্ষের ন্যায় পাশে থাকার জন্য বন্ধন পরিষদকে এবং কারিগরি সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট সকলকের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা। ধন্যবাদ BSPCI পরিবারের সকল সদস্যকে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য।

মা দুর্গার আশীর্বাদে জগতের সবার জীবন শান্তিপূর্ণ হোক। মা দুর্গার মহিষাসুর বধের মত আমরাও যেন আমাদের মনের অসুরের সাথে সাথে এবার মহামারী করোনা ভাইরাসকেও বধ করতে সমর্থ হই।



- ডাঃ প্রভাত রায়, সম্পাদক

Bangali Society for Puja and Culture Inc. (BSPCI), WA

Executive Committee 2020-2021

President	: Dipok Chandra Sarker
Vice-President	: Biplob Paul
General Secretary	: Uttam Dewanjee
Assist General Secretary	: Jisu Sen Gupta
Treasurer	: Debashis Saha
Publication Secretary	: Provat Roy
Cultural Secretary	: Nandita Roy
Assist. Cultural Secretary	: Ipsito Barnik Arko
Religious Secretary	: Anu Sharma
Assistant Religious Secretary	: Sithi Chakraborty
Advisory Members	: Jahar Chowdhury
	: Saumitra Seal
	: Tanmoy Debnath
	: Subarna Chowdhury





সূচীপত্র

১. দুর্গাতি নাশিনী "মা দুর্গা" - অমর নাথ চক্রবর্তী	পৃষ্ঠা ২
২. দত্তকুলোডব কবি শ্রীমধুসূদন - বিশ্বজিৎ বসু	পৃষ্ঠা ২
৩. উপেক্ষিতা - শর্মিষ্ঠা সাহা	পৃষ্ঠা ৫
৪. আমার দুর্গা - স্বপন কুমার সাহা	পৃষ্ঠা ৬
৫. ফেলে আসা বাংলাদেশ - ডাঃ সুরঞ্জনা জেনিফার রহমান	পৃষ্ঠা ৭
৬. Drawing By: Srija (13 years old)	পৃষ্ঠা ৭
৭. মা দুর্গা- শুধুই কি মূর্তি? - শুভংকর বিশ্বাস	পৃষ্ঠা ৮
৮. Drawing By: Dr Niti Nova Debnath (1)	পৃষ্ঠা ৮
৯. The Beach Day! - Dipannita Saha (9 years old)	পৃষ্ঠা ৯
১০. Lost and Found - Prithul Bisshay (12 years old)	পৃষ্ঠা ৯
১১. The Haunted House – Just the Beginning - Elora Galib (9 years old)	পৃষ্ঠা ১০
১২. The Squabble - Irfan Galib (Leo) [Year 1]	পৃষ্ঠা ১২
১৩. Moving - Joyoti Sarker (8 years old)	পৃষ্ঠা ১২
১৪. Mopoke - The Owl - Promiti Sarker (12 years old)	পৃষ্ঠা ১৩
১৫. Drawing By: Joyoti Sarker (8 years old)	পৃষ্ঠা ১৩
১৬. Drawing By: Promiti Sarker (12 years old)	পৃষ্ঠা ১৩
১৭. হে অনাগত সময় - ডাঃ মখদুম আজম মাসরাফী	পৃষ্ঠা ১৩
১৮. আমার দুর্গা - বুলু রানী ঘোষ	পৃষ্ঠা ১৪
১৯. দুর্গাতিনাশিনী - দীপ্তি কনা রায় চৌধুরী	পৃষ্ঠা ১৪
২০. Drawing By: -Prithul Bisshay (12 years old)	পৃষ্ঠা ১৪
২১. Drawing By: Dr Niti Nova Debnath (2)	পৃষ্ঠা ১৫
২২. অঙ্কুরিত বিশ্বাস - মলি সিদ্দিকা	পৃষ্ঠা ১৭
২৩. দুটি কবিতা - অনুরাধা মুখোপাধ্যায়	পৃষ্ঠা ১৭
২৪. দুটি কবিতা - খলিলুর রহমান	পৃষ্ঠা ১৮
২৫. Drawing By: Sreyoshi Sen Mohor	পৃষ্ঠা ১৮
২৬. বেঁচে থাকো - বিরঞ্জন সূত্রধর	পৃষ্ঠা ১৯
২৭. প্ররোচিত - ডাঃ আমেনা বেগম ছোটন	পৃষ্ঠা ১৯
২৮. করোনা এবং আমরা - স্বর্ণা আফসার	পৃষ্ঠা ২১
২৯. অহর্নিশ - অয়ন চৌধুরী	পৃষ্ঠা ২৩
৩০. Drawing By: Aaron Saha (9 years old)	পৃষ্ঠা ২৩
৩১. A long journey that left three certain Sirs' "khoob khoobdharto" - Riana Debnath (12 years old)	পৃষ্ঠা ২৪
৩২. JOKES! - Shayan Dash	পৃষ্ঠা ২৪
৩৩. Drawing By: Dipannita Saha (Troyee) [9 years old]	পৃষ্ঠা ২৫
৩৪. অতি-পাণ্ডিত্যের দৌরাণ্ড্য - আজিজ ইসলাম	পৃষ্ঠা ২৫
৩৫. মিতি - কমলেশ রায়	পৃষ্ঠা ২৬
৩৬. মা দুর্গা - ডলি সাহা	পৃষ্ঠা ২৭
৩৭. প্রযুক্তি, সংযুক্তি, অতঃপর... - দীপ জন মিত্র	পৃষ্ঠা ২৮
৩৮. অপূর্ণতা - সুমিতা বিশ্বাস সুমি	পৃষ্ঠা ২৯
৩৯. সামাজিক দূরত্ববাদ: বাংলার বাউল দর্শনের প্রায়োগিক মতবাদ - ড. আমজাদ হোসেইন	পৃষ্ঠা ৩০
৪০. The Bangladeshi Community in Western Australia: through a Generational Lens - Rita Afsar, PhD	পৃষ্ঠা ৩২





দুর্গতি নাশিনী "মা দুর্গা"

-অমর নাথ চক্রবর্তী

আজ মহালয়ার পুন্য লগনে অধিষ্ঠিত হলেন ধরাধামে মা দুর্গা। এই শুভক্ষণে আমরাও শঙ্খ বাজিয়ে ও উলুধ্বনির মাদ্রমে ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করে মাকে বরণ করে নেব। আজকের এই শুভলগ্নে সবাইকে জানাচ্ছি শারদীয়া শুভেচ্ছা।

যখনই ধরাধামে নেমে আসে অসুরারি অত্যাচার, অবিচার, পাপ ও অন্যায় - ঠিক তখনই অসুর দমনকারী মা দুর্গার আবির্ভাব হয়। মা তার দশ হাতে দশ প্রকার অস্ত্র ধারণ করে অসুরদের দমন করেন। সেই প্রতীককেই অবলম্বন করে প্রতিবছর আমাদের এই দুর্গা পূজো। এ বছর করোনাসুরকে বধ করতেই মায়ের আগমন। করোনাসুর এর ভয়ঙ্কর রূপ। সে রাক্ষস রূপে এসেছে পৃথিবীকে বিনাশ করতে। মহামারী রূপে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়েছে। তার কাছে নেই কোনো ছোট বড়। ছোটদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার কাছে আসতে তার সাহস কম। তবে ৭০ বছরের উর্ধে বয়স্কদের সে সহজেই আক্রান্ত করে, এমনকি জীবনটাও কেড়ে নেয়।

চিকিৎসকরাও "করোনার" কাছে হেরে যাচ্ছেন। অনেক চিকিৎসকদের জীবনও কেড়ে নিয়েছে এই করোনা। এই ভাবে পৃথিবীকে হার মানিয়ে যখন দাপিয়ে চলেছে করোনাসুর - ঠিক তখনই "দুর্গতিনাশিনী" মায়ের আগমন। মা দুর্গা একদিন কঠিন হাতে করোনাকে দমন করবেন। প্রথম দিকে এই করোনাসুর সমস্ত লোককেই ঘরে আবদ্ধ করে ফেলেছিল। এখন আর কেউ ঘরে আটকে নেই। মা তাদের গৃহবন্দি থেকে মুক্ত করেছেন। সবাই অনেকটা স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা করছেন। এখন প্রায় অসুস্থ মানুষই সুস্থ। আক্রান্তের সংখ্যাও আগের তুলনায় অনেক কম। করুণাময়ী মা সবাইকে মুক্ত করছেন। যে মা আমাদের করোনার হাত থেকে মুক্ত করছেন - তার আরাধনায় আমরা ব্রতী হবো অক্টোবর মাসের ২২, ২৩, ২৪ ও ২৫ তারিখে। অর্থাৎ দুর্গাপূজোর সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী তিথিতে। সোনার মন্দিরে হবে "মা" এর অবস্থান। আমরা নানা ফুলের ডালা সাজিয়ে মন্দিরে মন্দিরে যাবো "মা" কে পুষ্পাঞ্জলি দিতে। মা যেন আমাদের সবাই কে করোনাসুরের হাত থেকে রক্ষা করেন।

অন্যান্য বছরের মতো এবছরও অর্থাৎ ২০২০ সালেও অনুষ্ঠিত হতে চলেছে অস্ট্রেলিয়ার পার্কে মা শারদীয়া দুর্গা পূজো। তাই পূজো দেখার আনন্দে সবার মেতে উঠেছে প্রাণ। সবার মনেই আজ আনন্দের দোল। অন্যান্য বছরের মত আমরা সবাই ছুঁটে যাবো মন্দিরে মন্দিরে মা এর রাতুল চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে। মা এর কাছে চেয়ে নেবো আশীর্বাদ, আমরা সবাই যেন সুখে শান্তিতে দীর্ঘ জীবন নিয়ে বেঁচে থাকতে পারি। গত ২০১৮ সালে আমরা পার্কে থেকে "মা" এর পূজো উদযাপন করেছিলাম। এ বছর অর্থাৎ ২০২০ সালেও পার্কে আছি। মনে ইচ্ছা মায়ের পূজো দেখবো ও পুষ্পাঞ্জলি দেব।

এ বছরের পূজোর আয়োজকরা পূজোর আয়োজন করছেন। শুনে খুবই ভালো লাগল। অন্যান্য বছরের মত এবারও ভালোভাবে পূজো উদযাপিত হবে তাই কামনা করছি। দুর্গতিনাশিনী মা যেন আমাদের সকলের মঙ্গল করেন।

পরিশেষে এই বছরের পূজোয় সবার সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করে শেষ করছি।

দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন

-বিশ্বজিৎ বসু

মধুসূদন দত্তের জন্ম যশোর জেলার সাগরদাডী গ্রামে ১৮২৪ সালের ২৫শে জানুয়ারী। তাঁর মায়ের নাম জাহ্নবী দেবী, বাবা রাজ নারায়ণ দত্ত। মায়ের হাতে প্রাথমিক শিক্ষা শুরুর পর মধুসূদন ভর্তি হন সাগরদারীর পাঠশালায়। রাজ নারায়ণ দত্ত পেশায় ছিলেন উকিল। থাকতেন কোলকাতায়। মধুসূদনের বয়স যখন সাত বছর রাজনারায়ণ দত্ত স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে বসবাস শুরু করেন কলকাতার খিদিরপুরে।

মধুসূদন ভর্তি হন খিদিরপুর স্কুলে। সেখানে দু বছর পড়ার পর ১৮৩৩ সালে মধুসূদন ভর্তি হন হিন্দু কলেজে জুনিয়র বিভাগে। হিন্দু কলেজেই তিনি বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৩৪ সালে কলেজের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে "নাট্য-বিষয়ক প্রস্তাব" পাঠ করে তাঁর প্রতিভার প্রকাশ ঘটান। এখানে পড়াকালীন সময়ে নারী শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ লিখে তিনি স্বর্ণপদক পান। এ কলেজে তাঁর সহপাঠি ছিলেন রাজ নারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গৌরদাস বসাক, ভোলানাথ চন্দ্র। এরা প্রত্যেকে ছিলেন বাংলার রোঁনেসা যুগের এক একজন কিংবদন্তী।

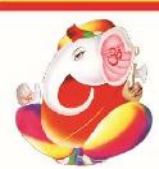
হিন্দু কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন। তার কবিতার ক্লাসে গিয়ে মধুসূদন হয়ে গেলেন ওয়ার্ডওয়ার্থ, শেলী এবং বায়রনের ভক্ত। তিনি লেখা শুরু করেন ইংরেজি কবিতা। জ্ঞানান্বেষণ, Bengal Spectator, Literary Gleamer, Calcutta Library Gazette, Literary Blossom, Comet প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে।

ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসনের ক্লাস করে মধুসূদন স্বপ্ন দেখা শুরু করলেন বড় কবি হবার। বায়রণ হয়ে গেল তাঁর ভাব গুরু এবং আদর্শিক রোল মডেল। কবি হবার স্বপ্নে বিভোর মধুসূদন তাঁর বন্ধু গৌরদাস বসাককে চিঠিতে লিখেছিলেন কবি আলেকজান্ডার পোপের বিখ্যাত উক্তি "কবি হতে গেলে প্রয়োজনে বাবা-মা, ঘর... সব ছাড়তে হবে।" সাথে আরও লিখেছিলেন "একদিন সে বড় কবি হবে, গৌরদাস বসাক যেন সেই মহাকবির জীবনী লেখে"। কিন্তু কলকাতায় থেকে বড় কবি হওয়া যাবে না। বড় কবি হলে যেতে হবে ইংল্যান্ডে।

মধুসূদনের স্বপ্ন তখন কবি হবার এবং ইংল্যান্ড যাবার। তখন তিনি কলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেন্টের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। বাবা রাজ নারায়ণ দত্ত বিয়ে ঠিক করলেন নাবালিকা এক জমিদার কন্যার সাথে। কিন্তু বেঁকে বসলেন মধুসূদন। তার সোজা জবাব "বিলিতি কায়দায় কোটশিপ না করলে সে কি আর প্রেম, আর প্রেম করে বিয়ে না করলে সে কি আর বিয়ে"।

এসময়ে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা কমলমনির সংগে গড়ে উঠে প্রেমের সম্পর্ক। কৃষ্ণমোহন ছিলেন প্রথম বাঙালি যিনি খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বেঙ্গল খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি।

১৮৪৩ সালে মধুসূদন হঠাৎ করে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। বাবার পছন্দের নাবালিকা মেয়েকে বিয়ে না করা, কমলিনিকে বিয়ে করা এবং খ্রিস্টান হলে ইংল্যান্ডে যাওয়া সহজ হবে এই ত্রয়ী লক্ষ্যে তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। নামের আগে যুক্ত হয় মাইকেল। খ্রিস্টধর্মগ্রহণে





প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার কন্যা কমলিনি। খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ উপলক্ষে মধুসূদন প্রার্থনা গান লিখেছিলেন।

কিন্তু কমলিনীর সংগে মধুসূদনের সম্পর্ক বিয়ে পর্যন্ত গড়ায়নি। পরবর্তীতে তার বিয়ে হয় প্রথম বাঙালি তথা প্রথম এশিয়ান ব্যারিস্টার জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের অন্য একটি শাখার সদস্য এবং রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফলোয়ার। তাকেও কৃষ্ণমোহন খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন।

হিন্দু কলেজে খ্রিস্টানদের পড়াশুনা করার সুযোগ ছিল না বিধায় মধুসূদন ১৮৪৪ সালে ভর্তি হন বিশপ কলেজে। প্রথম দিন বিশপ কলেজে গিয়ে মধুসূদন ফেলে দিলেন হইচই। সেখানে নেটিভ এবং সাদাদের আলাদা পোশাক পড়ার রীতি ছিল। মধুসূদন গেলেন কোর্ট-টাই পড়ে। এখানে ভর্তি হয়ে তাঁর জন্য নতুন দ্বার খুলে যায়। তাঁর শেখার সুযোগ হয় গ্রিক এবং ল্যাটিন ভাষা।

বিশপ কলেজে পড়াশুনা ছিল ব্যয়বহুল। কিন্তু কোন ছাত্র যদি লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতো যে সে পড়াশুনা শেষ করে পাদ্রী হবে তাহলে তার ফি অনেক কম হতো। ছেলেকে পাদ্রী হওয়া থেকে ঠেকানো এবং ভবিষ্যতে স্বধর্মে ফিরে আসবে সেই ক্ষীণ আশায় রাজ নারায়ণ পড়াশুনার খরচ চালিয়ে যান।

১৮৪৮ সালে তিনি মাদ্রাজ যান এবং মাদ্রাজ মেল অরফ্যান এসাইলাম বিদ্যালয়ে ইংরেজি শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। এ বছর তিনি অরফান এসাইলামের বালিকা বিভাগের ছাত্রী রেবেকা ম্যাস্টারিসকে বিয়ে করেন। মাদ্রাজের ইংরেজি পত্রপত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ এবং কবিতা প্রকাশ হতে থাকে। একাধিক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগেও তিনি যুক্ত হন। এসময়ে একটি সভায় 'দি অ্যাংলো স্যাক্সন অ্যান্ড দ্য হিন্দুজ' নামে এক বক্তৃতায় তাঁর খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন।

তিনি Eurasian (পরে Eastern Guardian), Madras Circulator and General Chronicle ও Hindu Chronicle পত্রিকা সম্পাদনা করেন এবং Madras Spectator-এর সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ইউরেশিয়ান-এ প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর নাটক 'রিজিয়া' যা ব্লাঙ্ক ভার্স বা অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাঁর প্রথম লেখা। তিনি এ সময়ে বৃটেনের ব্লাকউড ম্যাগাজিন এবং বেন্টলির মিসিলানি সম্পাদকীয় লিখে পাঠান। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সেগুলো প্রকাশ করেনি।

মাদ্রাজে থাকাকালীন সময়ে Timothy Penpoem ছদ্মনামে ইংরেজি গীতি কবিতা এবং খন্ড কাব্য লিখতেন। ১৮৪৮ সালে তাঁর Visions of the past এবং The captive Lady কবিতা দুটি বই আকারে প্রকাশিত হয় Captive lady নামে। বইটি প্রকাশ করেছিল মাদ্রাজের এক প্রকাশনী। মূল্য ছিল দুই টাকা। মাইকেল তাঁর প্রিয় বন্ধু গৌরদাস বসাককে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছিলেন "যদি চল্লিশ জন গ্রাহক সংগ্রহ করে দিতে পারে এবং দুই টাকা দিয়ে যদি বইটি কিনে তাহলে তাঁর ছাপার খরচটা উঠে আসে"। বইটি রিভিউয়ের জন্য তিনি পাঠিয়েছিলেন 'অ্যাথেনিয়াম' আর কলকাতার 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকায়। 'অ্যাথেনিয়াম' বইটির গুনগান করলেও 'বেঙ্গল হরকরা' চরম নেগেটিভ সমালোচনা করে। বন্ধু গৌরদাস বসাকের মাধ্যমে বেথুন সাহেবকেও একটি বই পাঠিয়েছিলেন মাইকেল। বেথুন সাহেবও বেঙ্গল হরকরার পথে হাটলেন। তিনি বললেন 'মাইকেল ইংরেজিতে না লিখে মাতৃভাষা বাংলায় সাহিত্যচর্চা করলে দেশীয় লেখকদের

বেশী কাজে লাগবে'। এ মন্তব্যের পর মাইকেলের স্বপ্ন ভেঙ্গে গিয়েছিল। মাইকেল এর পরে আর ইংরেজিতে কোন কাব্য লেখেননি।

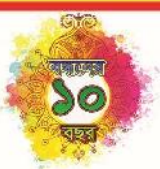
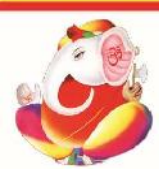
১৮৫১ সালে কবি মাতা জাহ্নবী দেবী মৃত্যবরণ করেন। মাইকেল কলকাতায় এসে বাবার সংগে দেখা করে আবার মাদ্রাজ ফিরে যান। পরের বছর ১৮৫২ সালে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিক্ষক পদে যোগদান করেন।

মধুসূদন-রেবেকা দম্পতির ঘরে জন্ম হয় দুই মেয়ে বার্থা ও ফিবি আর দুই ছেলে জর্জ এবং মাইকেল। তবে তাঁদের দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল না। এ সময়ে মধুসূদনের সাথে হেনরিয়েটার পরিচয় হয়। হেনরিয়েটার মায়ের মৃত্যুর পর তার বাবা বিয়ে করেছিল হেনরিয়েটার সমবয়সি এক মেয়েকে। প্রায় সমবয়সি মধুসূদন হয়ে উঠেছিল দুঃখ প্রকাশের ক্ষেত্র। পরে তাঁদের সম্পর্ক গড়ায় প্রেমে। মধুসূদন বিবাহ বিচ্ছেদ চায় রেবেকার কাছে। কিন্তু রেবেকা রাজি হয় না। এরকম পরিস্থিতিতে ১৮৫৫ সালে মৃত্যু হয় রাজ নারায়ণ দত্তের। মধুসূদন স্ত্রী সন্তানদের রেখে চলে আসেন কলকাতায় ১৮৫৬ সালে। কলকাতায় ফিরে তখন নতুন সমস্যা। তাঁর সকল পৈত্রিক সম্পত্তি তখন আত্মীয়দের দখলে। খিদিরপুরের বাড়ী, যশোরের তালুক এমনকি মায়ের স্বর্ণালঙ্কারের উত্তরাধিকার আদায়ে জড়িয়ে পড়েন মামলায়। সংসার এবং মামলা চালাতে যোগদেন কলকাতার পুলিশ কোর্টের জুডিশিয়াল ক্লার্ক হিসাবে। আড়াই বছর পর হেনরিয়েটা কলকাতায় চলে আসেন। তারপর দুজনে একসঙ্গে বসবাস শুরু করেন।

১৮৫৮ সালে শ্রী হর্ষের রত্নাবলী নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন এবং যুক্ত হন বেলগাছিয়া নাট্যশালার সাথে। রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের আগ্রহে মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে মধুসূদন রচনা করেন নাটক শর্মিষ্ঠা। এটি তাঁর প্রথম বাংলা নাটক এবং পাশ্চাত্য নাট্যরীতির অনুসরণে বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম নাটক। উল্লেখ্য যে পরবর্তীতে হেনরিটার গর্ভে জন্ম নেওয়া তাঁর কন্যা সন্তানের নাম রেখেছিলেন শর্মিষ্ঠা। নাটকটি ১৮৫৯ সালে ওরা সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়া থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। আর বই আকারে প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালের জানুয়ারি মাসে। মধুসূদন পরে এ নাটকের ইংরেজি অনুবাদও করেন।

১৮৫৯ সালের শুরুর দিকে কবি গ্রিক পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে রচনা করছিলেন পদ্মাবতি নাটক। সে সময়ে তিনি প্রথম বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করেন। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে প্রথম এ ছন্দের প্রয়োগ করেন। নাটকটি বই আকারে প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালে। এ সময়েই বেলগাছিয়া নাট্যশালার মঞ্চগয়নের উদ্দেশ্যে তিনি রচনা করেন দুটি প্রহসন "একেই কি বলে সভ্যতা" এবং "ভগ্ন শিব মন্দির"। প্রভাবশালী একটি মহলের আপত্তির ফলে নাটক দুটি তখন মঞ্চগয়ন হয়নি। পরবর্তীতে "ভগ্ন শিব মন্দির" নাটকটির নাম পরিবর্তন করে রাখেন "বুড়ো শালিখের ঘারে রো"। নাটক দুটি বই আকারে প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে।

১৮৫৯ সালের জুলাই মাসে তিনি লেখা শুরু করেন তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য। কাব্যের প্রথম দুই স্বর্গ প্রকাশিত হয়েছিল বিবিধার্থ সংগ্রহ নামে একটি সাময়িক পত্রে। সাময়িকীটির সম্পাদক ছিলেন রাজেন্দ্র লাল মিত্র। কাব্যটি ১৮৬০ সালের জানুয়ারি মাসে বই আকারে প্রকাশিত হয়। কাব্য গ্রন্থটি প্রথম পূর্ণাঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। বইটি প্রকাশে অর্থ দিয়েছিলেন রাজা যতিন্দ্রমোহন ঠাকুর। কবি বইটি তাকে উৎসর্গ করেছিলেন।





মধুসূদনের পরবর্তী প্রকাশিত গ্রন্থ “মেঘনাদ বধ” কাব্য এবং বাংলা ভাষায় রচিত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্য। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এ মহাকাব্যের জন্য তিনি অমর হয়ে আছেন বিশ্ব সাহিত্য জগতে। মহাকাব্যটি ১৮৬১ সালের জানুয়ারি মাসে দুই খণ্ডে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশনার খরচ বহন করেছিলেন রাজা দীপেন্দ্র মিত্র। গ্রন্থ দুটি মধুসূদন উৎসর্গ করেছিলেন রাজা দীপেন্দ্র মিত্রকে। ১৮৬১ এবং ১৮৬২ সালে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় কবির ব্রজাঙ্গনা কাব্য এবং বীরাঙ্গনা কাব্য।

নীল বিদ্রোহের উপর ভিত্তি করে দীনবন্ধু মিত্র নাটক লিখেন নীল দর্পণ। বই আকারে প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালে। জেমস্ লং এর উৎসাহে এ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন মাইকেল।

১৯৬০ মামলায় মধুসূদন জয়ী হয়ে সম্পত্তি ফেরত পান। মামলায় জিতে মধুসূদন প্রস্তুতি নেন ইংল্যান্ডে গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়ার। খিদিরপুরের বাড়ী বিক্রি করেন সাত হাজার টাকায়। যশোরের তালুক পত্তনি দেন। শর্ত হয় পত্তনি গ্রহীতা সেখান থেকে মাসে ১৫০ টাকা হেনরিয়েটাকে খরচ বাবদ দিবে এবং ইংল্যান্ডে টাকা পাঠাবে।

‘মেঘনাদ বধ’ কাব্য লিখতে লিখতে তিনি লেখা শুরু করেছিলেন নাটক ‘কৃষ্ণকুমারী’ যেটি বই আকারে প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে।

১৮৬২ সালে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য মধুসূদন ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। লন্ডনে গিয়ে ভর্তি হন ‘গ্রে’স ইন্’ এ। ইংল্যান্ডে তিনি বসবাস শুরু করেন মোনমোহন ঘোষ এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেজদা। তিনি আই সি এস পরীক্ষায় প্রস্তুতির জন্য ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। আর মোনমোহন ঘোষ সেখানে ব্যারিস্টারি পড়তেন। মোনমোহন ঘোষ ছিলেন কোলকাতা হাইকোর্টে প্রাকটিস করা প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার। প্রথম ব্যারিস্টার জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাকটিস করতেন ইংল্যান্ডে।

এখানেই শুরু হয় কবির কঠিন অর্থনৈতিক সমস্যা। পৈতৃক সম্পত্তি আয় থেকে যারা টাকা পাঠানোর দায় নিয়েছিলেন, কয়েকমাস পর তারা টাকা পাঠানো বন্ধ করে দেন। এমনকি তারা হেনরিয়েটাকেও টাকা পয়সা দেয়া বন্ধ করে দেন। হেনরিয়েটা চরম আর্থিক দুর্দশায় পড়েন। এমতাবস্থায় ১৮৬৩ সালে হেনরিয়েটা কোন রকমে কিছু টাকা পয়সা সংগ্রহ করে সন্তানদের নিয়ে লন্ডন চলে যান। চরম অর্থনৈতিক সংকটে এবং সেই সাথে বর্ণবাদের শিকার হয়ে তিনি চলে যান ফ্রান্সের ভার্সায়ে নগরীতে।

চরম এ অর্থনৈতিক সংকটে মধুসূদন শরনাপন্ন হন বিদ্যাসাগরের কাছে। বিদ্যাসাগর টাকা পাঠাতে থাকেন। বিদ্যাসাগরকে লেখা তাঁর চিঠির ভাষা ছিল এরকম “বাঁচান, আপনি না দেখলে বাঁচব না।” চিঠিতে লিখেছেন, “আমার সব আশা আপনার উপরে, আমি নিশ্চিত আপনি আমাকে হতাশ করবেন না। আর যদি করেন, তবে ভারতে ফিরে দু-এক জন লোককে সুকৌশলে পরিকল্পিত ভাবে খুন করে আমাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে”। বিদ্যাসাগর মধুসূদনের কথায় কখনও তাঁর সম্পত্তি মর্টগেজ করে, কখনও অন্যের কাছ থেকে শ্রেফ ধার করে টাকা পাঠাতেন মধুসূদনকে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের মত বাংলা ভাষার প্রথম সনেট রচয়িতা মাইকেল। ভার্সায়ে নগরীতে বসে তিনি শিক্ষালাভ করেন ফরাসি, ইতালীয় ও জার্মান ভাষা এবং ইতালীয় কবি পেত্রার্কের অনুকরণে বাংলায় সনেট লিখা শুরু করেন। এখানে বসেই তিনি লিখেন তাঁর বিখ্যাত সনেট “বঙ্গভাষা” এবং “কপোতাক্ষ নদ”।

তাঁর লেখা সনেটগুলি নিয়ে প্রথম “চতুর্দশপদী কবিতাবলী” নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ সালে।

১৯৬৫ সালে তিনি ব্যারিস্টারি পাশ করেন এবং ১৮৬৬ সালের ১৭ই নভেম্বর তিনি লন্ডনে বারের ডাক পান এবং বারের নৈশভোজে অংশগ্রহণ করেন। ভার্সায়ে থেকে ফিরে কিছুদিন বসবাস করেছিলেন শেফার্ড বুশে। ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন এবং কোলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টার হিসাবে যোগ দেন।

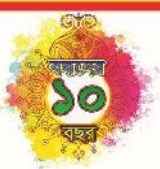
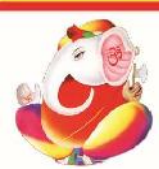
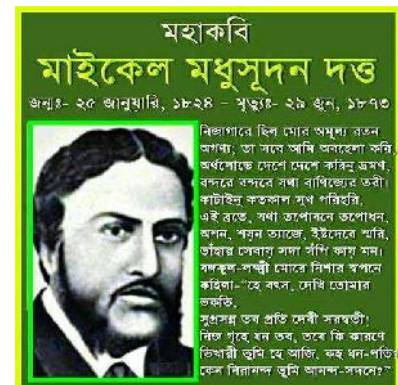
কোলকাতা হাইকোর্টে প্রাকটিস করে অল্প সময়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু তখন তিনি ইউরোপীয় জীবন যাপনে অভ্যস্ত আয় ব্যয়ের সমতা না থাকা এবং বিশৃঙ্খল জীবন যাপন করায় আবার পড়ে যান দুর্বিপাকে। পসার নষ্ট করে ফেলেন। এ অবস্থায় ব্যারিস্টারি ছেড়ে যোগ দেন প্রিভি কাউন্সিল আপিল বিভাগে। এখানে কবির বেতন ছিল মাসিক পনের শত টাকা। কিন্তু দু বছরের বেশী তিনি সেখানে কাজ করতে পারেন নাই। আবার ফিরে আসেন আইন ব্যবসায়।

মহাকবি হোমারের ইলিয়াড কাব্যের কাহিনী অবলম্বনে তিনি লেখা শুরু করেন হেক্টর বধ। কিন্তু কবি সেটা শেষ করতে পারেননি। এখানে ইলিয়াডের বারটা অধ্যায়ের অনুবাদ তিনি করতে পেরেছিলেন। সেই বারটির অনুবাদ বই আকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর।

এখন আর পসার জমাতে পারলেন না, ১৮৭২ সালে তিনি চাকরিতে যোগ দেন মানভূমে পঞ্চকোট রাজার আইন উপদেষ্টা হিসাবে। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে সে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন কলকাতায়। তখন কবির শরীরে নানা রোগ বাসা বেঁধেছে। সেই সাথে দেনার দায়ে জর্জরিত।

১৮৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বেঙ্গল থিয়েটার। এখানে মঞ্চগয়নের উদ্দেশ্যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তিনি মায়ী কানন নাটক লেখেন। ১৮৭৪ সালের মার্চ মাসে বই আকারে প্রকাশিত হয় আর অভিনীত হয় এপ্রিল মাসের ১৮ তারিখে। ১৮৭৩ সালের এপ্রিল মাসে জমিদার জয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বেনেপুকুরের বাড়ী থেকে কবি সপরিবারে বসবাস শুরু করেন পাবলিক লাইব্রেরীর দোতালায়। তখন তিনি লিভার সিরোসিস, ড্রপসি, গলার ও হাটের রোগী। মাসখানেকের মধ্যে কবি ফিরে যান তাঁর বেনে পুকুরের বাড়ীতে। জুন মাসের শেষের দিকে মুমূর্ষু অবস্থায় কবিকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। হাসপাতালে থাকাকালীন সময়ে জুন মাসের ২৬ তারিখে হেনরিয়েটা মারা যান। তার মাত্র তিন দিন পর ২৯শে জুন রবিবার বেলা দুটোর সময় জীবনাবসান ঘটে দত্ত কুলোডব কবি মধুসূদনের।

সূত্রঃ মধুসূদন রচনাবলী, কামরূপী প্রকাশালয়, open.ac.uk, আনন্দবাজার পত্রিকা, wikipedia, বাংলাপিডিয়া, ব্রিটানিকা এনসাইক্লোপিডিয়া।





উপেক্ষিতা

-শর্মিষ্ঠা সাহা

সূত্রধার: মহাকাব্য রামায়ণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অথচ অবহেলিত নারী চরিত্র উর্মিলা। জনকপুরের রাজা জনক ও রানী সুনয়নার কন্যা, সীতার বোন, পরবর্তীতে অযোধ্যার রাজা দশরথ ও রানী সুমিত্রার পুত্র লক্ষণের স্ত্রী তিনি। লক্ষণ যখন রাম ও সীতার সঙ্গে নির্বাসনে যান, উর্মিলা লক্ষণের সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু লক্ষণ দ্বিধাম্বিত মনে তাকে তার পিতা-মাতার যত্ন নেওয়ার জন্য অযোধ্যায় রেখে যান। ধর্মীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতকে বধ করতে এমন একজনকে প্রয়োজন ছিল যে চৌদ্দ বছর ব্রহ্মচর্য পালন করেছে। রাম যেহেতু স্ত্রীসহ বনবাসে যান, তার পক্ষে সেটা সম্ভব হত না। এজন্য কর্তব্যের অজুহাতে স্ত্রী উর্মিলাকে ছেড়ে যাওয়া ছাড়া লক্ষণের পথ ছিল না।

লক্ষণের বনবাস যাত্রার পূর্বক্ষেণে মর্মান্বিত স্ত্রী উর্মিলার সঙ্গে কথোপকথন হয়ত এমনি ছিল।

লক্ষণ: কি হয়েছে প্রিয়, বিষন্নতার আধার কেন ওই চাঁদ মুখে?

উর্মিলা: কি হয়েছে তা কি তুমি জান না, আমায় প্রশ্ন করছ?

লক্ষণ: সংবাদটা তবে তোমার কাছেও পৌছে গেছে।

উর্মিলা: জানোতো দুঃসংবাদ ঝড়ের চেয়ে দ্রুত দৌড়ায়। কিন্তু তুমি এত নির্বিকার কি করে। আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কা কি এতটুকু বিচলিত করেনি তোমাকে?

লক্ষণ: আমার প্রিয় ভাই, বন্ধু, দাদা রামচন্দ্র বনবাসে যেতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু ওই অজানা অরণ্যে অজস্র বিপদের আশংকা। আমি তাঁকে একা এই বিপদের মধ্যে ছেড়ে দিতে পারি না, তাই সঙ্গে যাচ্ছি। এ আমার কর্তব্য।

উর্মিলা: কর্তব্যের টানে হৃদয়কে ভুলে গেলে! বিচ্ছেদের বেদনা, হৃদয় ভাঙার জ্বালা – এসব কোথায়, কোথায় তোমার মুখে? তবে কি আমি শুধু ধর্মতোই তোমার অর্ধাঙ্গিনী, হৃদয়ে নই! আমার হৃদয়ে যে ভাঙনের সুর বাজে, তার এতটুকু ছোঁয়া কি লাগেনি তোমার হৃদয়ে?

লক্ষণ: তুমি আমায় ভুল বুঝ না প্রিয়ে। তোমায় আমি কি করে বোঝাই, তোমাকে ছেড়ে যেতে কতটা কাতর এ হৃদয় –মন। কিন্তু কর্তব্য আমার কাছে ধর্ম। ধর্ম রক্ষার জন্য এ হৃদয় পীড়া আমাকে সহ্যেই হবে।

উর্মিলা: কর্তব্য, ধর্ম – এসবের মোহে তুমি ভুলে গেলে আমার কথা, আমাদের সম্পর্কের কথা। ভুলে গেলে কর্তব্যের প্রলেপ দিয়ে এ হৃদয়ের জ্বালা কমানো যাবে না।

লক্ষণ: আমি কিছুই ভুলিনি। কিন্তু তুমি ভুলে গেছ, স্বামীকে ধর্মরক্ষায় সাহায্য করাই স্ত্রীর কর্তব্য, তাতে বাঁধা হয়ে দাড়ানো নয়।

উর্মিলা: উঃ আবার সেই কর্তব্য – তুমি কি আমাকে ধর্মচ্যুত হবার ভয় দেখাচ্ছ?

লক্ষণ: না, না .. সে কথা নয়। আমি শুধু বলতে চাইছি, আমাকে এভাবে দুর্বল করে দিও না, তোমার চোখের জল দিয়ে আমায় পিছু টেনো না। তুমি কি জান না, তোমার চোখের জল আমাকে কতটা কাতর করে?

উর্মিলা: তাই যদি হয় তবে যেয় না, থাক আমার কাছে। তোমাকে ছাড়া এই রাজবাড়ি আমার কাছে মৃত্যুপুরী। আমাকে এমন শান্তি তুমি দিও না।

লক্ষণ: এভাবে বল না। একটু বুঝতে চেষ্টা কর, তুমি যা চাইছো সেটা সম্ভব নয়।

উর্মিলা: কেন সম্ভব নয়? পিতৃ সত্য পালনে তোমার দাদাকে বনবাসে যেতে হবে, তোমাকে নয়।

লক্ষণ: অবুঝ হলো না উর্মিলা।

উর্মিলা: ও .. আমি অবুঝ! আমি বুঝে গেছি, আমার জন্য তুমি তোমার সঙ্কল্প পাল্টাবে না। তবে কেন মিথ্যে ভালবাসার কথা শোনানো, কেন এই ছলনা? তোমার উপেক্ষা তবু সহ্যে পারি, প্রবঞ্চনা সহ্য হয় না।

লক্ষণ: পাগলের মত কি সব বলছ – আমি তোমার সাথে ছলনা করছি? আমার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখ – দেখ কি দেখতে পাও – ছলনা না বিরহ বেদনা?

উর্মিলা: থাকতে যদি নাই পার, আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল।

লক্ষণ: সেটা সম্ভব নয় – বনবাসের ওই বিপদের মধ্যে আমি তোমাকে টেনে নিতে পারি না।

উর্মিলা: কেন সম্ভব নয়? দাদা তো সীতাকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি কেন যেতে পারি না?

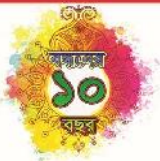
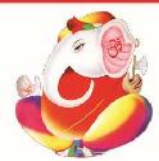
লক্ষণ: ভুলে যেমনা, দাদা – বৌদিকে বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্যই আমি যাচ্ছি। সেখানে তুমি গেলে, আমি আমার কর্তব্য ঠিকমত পালন করতে পারব না।

উর্মিলা: আবার সেই একই কথা। তুমি নিজেও থাকতে পার না, আমাকেও সঙ্গে নিতে পার না – আর্থাত বিচ্ছেদ অনিবার্য। তবে তাই হোক – তুমি পালন কর তোমার কর্তব্য, আমি থাকি এই প্রাসাদে বন্দী। তোমার দিন কাটবে বনে জঙ্গলে বিপদের সঙ্গে লড়াই করে, আমার কাটবে চোখের জলের লোনা কাব্য লিখে (কান্নায় ভেঙে পড়ে)।

লক্ষণ: যাবার আগে একবার, শুধু একবার আমার দিকে হাসিমুখে তাকাও উর্মিলা। তোমার আজকের হাসিমুখই হবে আমার চৌদ্দ বছরের বনবাসি জীবনের পাথর।

উর্মিলা: আমার জীবন ছেড়ে দূরে, বহু দূরে চলে যাবে আমার জীবন কাঠি – এ আমি দেখতে পারব না, সহ্যে পারব না, কিছুতেই না। আমায় তুমি ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।

সূত্রধার: উর্মিলা বুঝেছিলেন লক্ষণের কাছে স্ত্রীর চেয়ে দাদার প্রতি কর্তব্য অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তাই স্বামীহীন চৌদ্দ বছর নির্বিয়ে পার করতে তিনি নিদ্রা দেবীর শরণাপন্ন হন, যিনি তাকে পুরোটা সময় ঘুম পারিয়ে রাখেন। আর এভাবেই নিরবে নিভৃত সীমাহীন অবহেলায় কেটে যায় তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো বছর। উর্মিলার তপস্যার ফলে লক্ষণ পরবর্তীকালে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতকে বধ করতে সক্ষম হন। রামায়ণের বীর যোদ্ধা রামের বিশ্বস্ত সঙ্গী কর্তব্যনিষ্ঠ লক্ষণকে সবাই এক নামে চিনলেও উর্মিলা কিন্তু নিভৃতই রয়ে গেছেন। তার ত্যাগের মহিমা মহাকাব্যের পাতায় ঠিক উপযুক্ত মূল্যায়নে আলোকিত হয়নি। তিনি জীবনেও যেমন নিভৃতচারিণী, লেখকের কাছেও তেমনি উপেক্ষিতা।





আমার দুর্গা

-স্বপন কুমার সাহা

(প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, লালমাটিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়)

দুর্গা পূজা আসছে। আমার দুর্গা পূজা আসছে। শৈশবে এই সংবাদটি যেমনভাবে মনে আলোড়ন তুলতো এখন আর সেভাবে সাড়া দেয় না। এটাকে আমি বয়সের ধর্ম বলেই ধরে নিয়েছি। শৈশবে শরতের প্রথমই চারিদিকে ঢাকের গুরুগুরু শব্দ মনটাকে নাচিয়ে দিত। প্রতিদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে কোথায় কোন বাড়িতে প্রতিমা তৈরি হচ্ছে সেটা দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তাম। দেখতাম কোন বাড়িতে শুধুমাত্র প্রতিমার কাঠামো তৈরি হয়েছে, আবার কোথাও কাঠামোর ওপর খড় দিয়ে প্রতিমার আকৃতি লাভ করেছে। তবুও সেগুলি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতাম এবং বন্ধুদের সাথে আলোচনা করতাম কোন বাড়ির প্রতিমা কেমন হবে। এমনি করেই প্রতিদিন ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে প্রতিমা গড়ার অগ্রগতি দেখার মধ্যেও একটা আনন্দ খুঁজে পেতাম। দেখতে দেখতে প্রতিমার উপরে মাটি পরতো সেটাকে বলা হত এক মেটে। যখন সেটা পালিশ করা হতো তখন তাকে বলা হত দোমেটে। মনের মধ্যে সারাক্ষণ প্রতিমা তৈরি সমাপ্তির দিনটির জন্য অপেক্ষা করতাম। প্রতিমা একদিন শেষ হতো, রং শুরু হতো, আকৃতি বুঝতে পারতাম। কিন্তু এ সময়ে প্রতিমা ঢেকে রাখার জন্য শিল্পীরা কখনো কখনো প্রতিমার সামনে আবরণ বুলিয়ে দিত। মনটা খারাপ হয়ে যেত কিন্তু প্রতিমা শেষ হয়ে যাচ্ছে এটাই আনন্দের বিষয়। ওদিকে বাড়িতে বাবা জামা প্যান্ট তৈরি করার জন্য আমাদের দর্জির দোকানে নিয়ে যেত। দর্জি যখন কাজ শুরু করেনি তখনই তার বাড়িতে বারবার হানা দিয়ে জানতে চাইতাম জামা কবে শেষ হবে। কিছুতেই দিনগুলো ফুরাতে চাইত না। এর মধ্যেই পূজা এসে পড়তো - কলকাতা থেকে বড়দা আসছেন আরেক প্রস্থ জামা প্যান্ট নিয়ে, আরেক আনন্দ। পূজার দিনগুলো গভীরভাবে উপভোগ করতাম মন্দিরে মন্দিরে প্রতিমা দেখে হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে। বাড়িতে এসে মায়ের তৈরি নাড়ু আর উপাদেয় খাদ্যগুলো মজা করে খেতাম সবাই মিলে। দশমীর দিনটা খুবই ব্যস্ততার মধ্যে কাটত। প্রতিমা বিসর্জনের পর বাড়ি এসে গুরুজনদের প্রণাম করে লুচি, ডাল, সবজি, পায়ের দিয়ে উদরপূর্তির মজাই ছিল অন্যরকম। এরপর গ্রামের অন্যান্য বাড়ি যেতাম গুরুজনদের প্রণাম করতে। তারা আরও খাওয়াতে চায়, কিন্তু কিছুতেই সেটা সম্ভব হতো না। পরের দিন যাকে বলে বাদ দশরা। সেদিন আমাদের বাড়িতে গ্রামের ছোট বড় সবাই আসত। সকলে যথাযোগ্য সম্মান বিনিময় করত এবং তাদের সকলকে আপ্যায়ন করা হতো সেই লুচি নাড়ু সুজি বুটের ডাল ইত্যাদি দিয়ে। সারাটা দিন দারুণ ব্যস্ত থাকতাম। মনে পড়ে এমন দিনে আমার ছোট ভাই সারাদিন শুধু লুচি খেয়ে থাকতো। তাকে জিজ্ঞেস করায় একবার সে বলল সারাদিনে সে ৩২ টা লুচি খেয়েছে। সবাই তাকে নিয়ে খুব হাসাহাসি করলো।

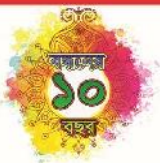
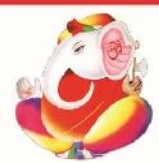
বিসর্জনের দিন যেমন মেলা বসতো, কোথাও কোথাও বিসর্জন এর পরের দিনও মেলা হতো। মেলা থেকে খেলনা কেনাটা ছিল পূজার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই ছিল শৈশব। সে শৈশব হারিয়ে যখন কলেজে পড়তে গেলাম তখন পূজার আনন্দটা একটু ভিন্নতর হলো। তখন বড়দা আসতে পারতেন না কলকাতা থেকে। আমাদের জন্য মা-বাবা, ছোট ভাই, ভাগ্নে ভাগ্নি - এরা সবাই অপেক্ষা করে থাকতো কখন কলেজ থেকে আসব। কলেজের ছুটি হলে তারপর আবার সেই পূজার আনন্দ। তবে তখন আনন্দের চেহারাটা আমাদের থেকে নিচের দিকে গড়িয়ে গেছে বেশি। বাবা সবার জন্য এই নাড়ু লুচির বাইরে আড়ং থেকে অনেক করে জিলিপি কিনে নিয়ে আসতেন।

সেটাও গরম গরম ভালো লাগতো। এরপর কলেজ পেরিয়ে শিক্ষকতায় ঢুকলাম, বাড়িতে থাকলেও তখন ছুটির জন্য একটি আকৃতি থাকতো মনের মধ্যে - কবে পূজা আসবে। সবার জন্য নতুন জামা কাপড়, খাবারের বৈচিত্র্য, সবার সঙ্গে একত্র হওয়া এই ছিল তারুণ্যের পূজো। পূজো মানে বড় পূজো, মানে দুর্গাপূজো। দিন যত পেরিয়ে গেছে আনন্দের উচ্ছ্বাস ভিন্ন দিকে বইতে শুরু করেছে। তখন গভীরতর চিন্তায় মনটা ব্যর্থ হত তখন ভাবতাম, কেন দুর্গার এই রূপ, কেন অসুর তার পায়ের তলে, মহিষ কোথা থেকে আসলো, মন্ত্র গুলোর অর্থ কি। এইসব ভাবনা বহুদিন ধরে ভেবেছি আর সকলের সাথে হাত জোড় করে নত মস্তকে ওঁদের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানিয়েছি।

ভিন্ন ভিন্ন মানুষের কাছে পূজার অর্থ ভিন্ন ভিন্ন, যিনি সাধারণ ভক্ত তার কাছে ওই মূর্তির দেবতাই সবকিছু, অন্য কোন ভাবনা তাদের মনে নেই। আমি যেহেতু মাঝে মাঝে এ নিয়ে একটু পড়াশোনা করতাম তাই দেবতার মূর্তির পিছনে শক্তির শক্তিরূপিনী দেবীকে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করলাম। যে আমার মনের অসুরকে সকলের মনের অহংকারকে সকল অপশক্তিকে ধ্বংস করতে পারে। বহুদিন ধরেই এই চিন্তায় খুশি ছিলাম তবে কিছুদিন পর থেকে আবারো চিন্তা ভিন্ন পথে পা বাড়াতে শুরু করলো। তখন আর দুর্গা শুধু আমার কাছে শক্তিরূপিনী দেবতা যার বছরে একবার আগমন হয়, যাকে সাধনা করে পেতে হয় এমন কেউ নন। তখন আমি দেবীকে দেখতে পেলাম আমাদের সমাজের মার খাওয়া নারীরূপী দেবীদের মধ্যে। সে দেবীরা মার খেয়ে নির্যাতনের কারনে চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যায়, কেউ কেউ আবার শত নির্যাতনের ভিতরেও মাথা উঁচু করে দেবীরূপে শক্তিরূপিনী দুর্গার রূপ ধরে সমাজের নির্যাতন-নিপীড়ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শুরু করে। আমার কাছে আধুনিককালের দেবী এরাই যারা নিপীড়িত হয় অত্যাচারিত হয় কিন্তু শক্তি হারায় না। যে শক্তির কাছে সামাজিক অপশক্তির পরাজয় ঘটে, আমি আজ দেবীকে সেই রূপে পূজা করতে চাই। আমার দুর্গা স্নেহময়ী মাতা, আমার দুর্গা মমতাময়ী প্রেয়সী, আমার দুর্গা সন্তান রক্ষার সংগ্রামরত আদরের ছোট বোন। পথে-প্রান্তরে যেখানে যত এই রকম দেবীরা ন্যায়ের পথে অত্যাচারের বিরুদ্ধে অবহেলার বিরুদ্ধে বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমাদের সকলের সাধনার ধন হয়ে থাকে। মন্দিরে মন্দিরে দেবীর আরাধনা, সে দেবী আমাদেরই একজন হয়ে আমাদের পাশে থাকবে আমাদের বন্ধু হবে আমাদের শক্তি হবে আমাদের চলার পথের পাথর হবে, তবেই দেবীর আরাধনার বড় সার্থকতা আমরা খুঁজে পাবো।



Drawing by: Apti Mistry (6 years Old)





ফেলে আসা বাংলাদেশ

-ডাঃ সুরঞ্জনা জেনিফার রহমান

সকাল থেকে একটা গান শুনছিলাম।

“ঠিক যেখানে দিনের শুরু,
অন্ধ কালো রাত্রি শেষ
মন যতদূর চাইছে যেতে,
ঠিক তত দূর আমার দেশ।
সব মানুষের স্বপ্ন
তোমার চোখের তাঁরায় সত্যি হোক
আমার কাছে দেশ মানে
এক লোকের পাশে অন্য লোক।”

দেশ ছাড়ার এবার ১৩ বছর। কোভিডের ছোবলে মেঝো চাচা মারা যাবার পর থেকে আরো বেশী করে মনে পড়ছে এটা। কেমন ছিলো সেই দিনটা? এয়ারপোর্ট রোডের হলুদ সোডিয়াম বাতি, মন খারাপ করা বন্ধুর মুখ, প্রিয়জনকে শেষবারের মত ছুঁয়ে দেখা, বারবার ঝাপসা হয়ে আসা আমাদের চোখ, এখনো ভীষন জীবন্ত। মনে হয় এইতো সেদিন। চার স্যুটকেস নিয়ে এসেছিলাম। সেই স্যুটকেসের মালপত্তর এখন কোথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে বলতেও পারবো না।

গত ১৩ বছরে প্রতিনিয়ত শিখেছি। এখনো শিখছি। পরিজনহীন শহরে দুজন মানুষের পথচলা, প্রতি মুহূর্তে আশেপাশের মানুষের বদলে যাওয়া, প্রতিশ্রুতি দিয়ে রক্ষা না করা, সম্পর্কের ভাঙ্গা গড়ার সাক্ষী হওয়া, অনাত্মীয় মানুষের অসীম ভালোবাসা পাওয়া, শূন্য থেকে নিজের পায়ে দাড়ানো, স্বপ্নের জন্ম আর বেড়ে ওঠা, ক্যারিয়ারের উত্থান পতন, দেশের প্রিয়জনদের আশুতে আশুতে জীবনের ওপারে চলে যাওয়া, এখানের বন্ধুগুলোর সময়ের পরিক্রমায় পরিবারে পরিনত হওয়া, ভালো খারাপ সব মিলিয়ে সময়টা কেটে গেছে এক নিমিষে।

এখন পেছনে তাকালে মনে হয়, কিভাবে পারলাম এত কিছু সামলে দিন কাটাতে। জানি না, সত্যিই জানি না। হয়তো, না পাওয়ার হিসাব করিনি বলেই এতটা সময় পার করতে পেরেছি, নিজের মনে সুখী থেকেছি।

দিন শেষে যখন মোহরের মত পুরোনো দিন গুনতে বসি তখন এই এত বছর পরেও বহু দূরে পড়ে থাকা কোলাহলে পূর্ণ প্রিয় শহরকে খুব মনে পড়ে; প্রিয় শহরের বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছা করে। যখন কোন হাইরাইজ বিল্ডিংয়ের পাশে দিয়ে যাই, নিজের ঢাকার বাসাটার কথা মনে হয়। হটাত কোন মানুষ কে দেখলে সেই প্রিয়জনদের কথা মনে হয়, যারা চলে গেছেন আমাদের ছেড়ে। আমার শৈশব, কৈশোর আর তারুণ্যের স্মৃতিগুলো সাথে নিয়ে।

ভালো থাকুক প্রিয় শহর, ভালো থাকুক প্রিয় শহরের মানুষেরা। একদিন আমিও যাদের ছিলাম। ওই শহর একদিন আমারো ছিলো। ওই শহরে আমার আপন কেউ ছিলো।

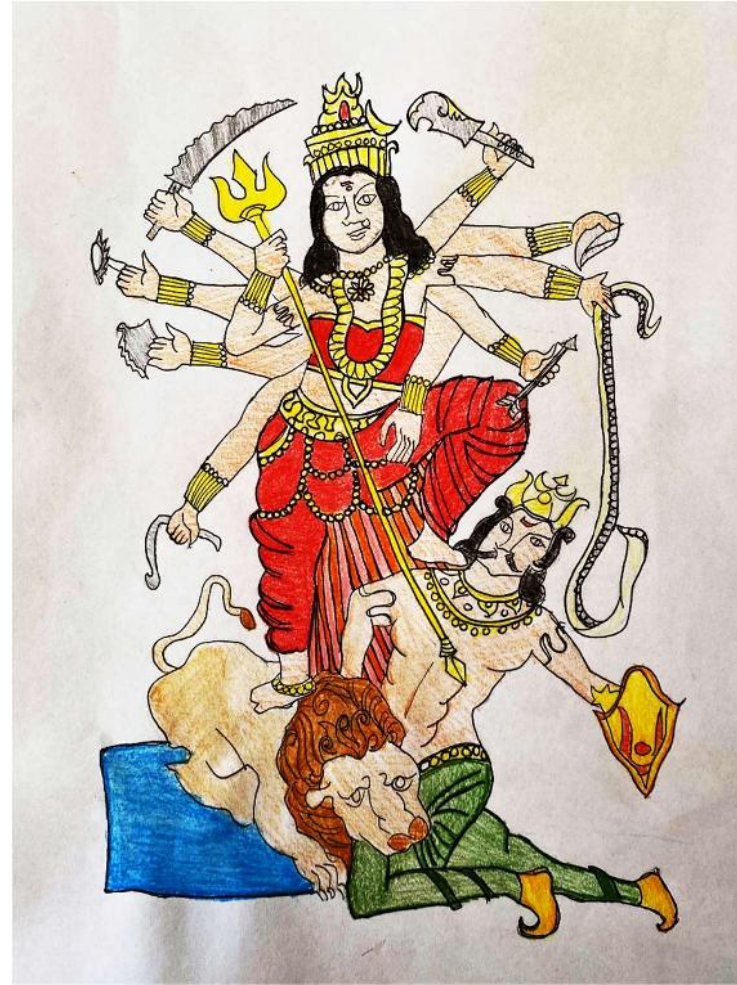
“নতুন সকাল গুলো কপাল ছুঁলো তোমারই
দূরে গেলেও এটাই সত্যি তুমি আমারই,

শুধু আমারই ..
রোদের মতো হাসলে না
আমায় ভালোবাসলে না,
আমার কাছে দিন ফুরালেও আসলে না।

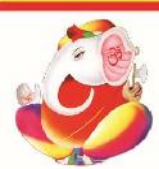
মেঘ আসে এলো কিসে
ছুঁয়ে দিলেই সব চুপ,
সেই মেঘবালিকার গল্প হোক,
শহরজুড়ে বৃষ্টি হোক,
রোদ্দুর হোক আজ শুধুই তাহার ডাকনাম।

পাতাভরা সব দু-টুকরোরা
কাল বৈশাখীর মতো মুখচোরা,
সব ভিজে যাক শুধু বেঁচে থাক অভিমান
নতুন সকালগুলো কপাল ছুঁলো তোমারই
বেঁধে রাখতে পারলে তুমিও হতে আমারই
শুধু আমারই ...”

** (সূত্রঃ গীতিকার-১: সমীর চট্টপাধ্যায়, গীতিকার-২: রানাজয় ভট্টাচার্য) **



Drawing By: Srija (13 years old)





মা দুর্গা- শুধুই কি মূর্তি?

-শুভংকর বিশ্বাস

হিন্দুরা বিশ্বাস করেন দেবতাগণ এই পৃথিবীতে বর্তমান না থেকেও পথ প্রদর্শন ও সাহায্য করতে পারেন। তাঁরা এই দেবগণের মূর্তি নির্মাণ করে উৎসব করেন এবং তাঁদের মাধ্যমে ঈশ্বরের পূজা করেন। এই দেবতাদের মূর্তিই প্রতিমা। হিন্দুরা জানেন এই মূর্তি ঈশ্বর নন। ঈশ্বরের ওপর মনোসংযোগ করার জন্য একটি মাধ্যম মাত্র এবং প্রতিমাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন প্রকৃতপক্ষে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপাসনা করা।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন-

”পুতুল পূজা করেনা হিন্দু কাঠ মাটি দিয়ে গড়া মৃন্ময়ী মাঝে চিন্ময়ী হেরে হয়ে যাই আত্মহারা।”

মূর্তির মাধ্যমে দেবতাদের ওপর মনোসংযোগ করাই মূর্তির একমাত্র উপযোগিতা। মূর্তিপূজা হচ্ছে কোন উৎসবের আনন্দ উপভোগ, জনসমাগম ও জনসংযোগের উপায়।

হিন্দুধর্ম যখন সারা ভারতবর্ষে বিস্তৃত হয়েছিল, তখন বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উপজাতির পূজিত অনেক দেবতার মূর্তিও হিন্দুধর্মের মূল উৎস স্রোতের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। ফলে অনেক ধরণের মূর্তির পূজা আরম্ভ হয়। যে কারণে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে এই মূর্তির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

হিন্দুধর্মে দেবী দুর্গা পরমা প্রকৃতি ও সৃষ্টির আদি কারণ। তিনি শিবের স্ত্রী পার্বতীর উগ্র রূপ, কার্তিক ও গনেশের জননী এবং কালীর অন্যরূপ। বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতে এবং আগমনী গানে দুর্গারূপে শিবজায়া হিমালয় দুহিতা পার্বতীর সপরিবারে গৃহে অবস্থানের আনন্দময় দিনগুলির (দুর্গাপূজা) এবং তার বিবাহিত জীবনের অপূর্ব বর্ণনা পাওয়ার যায়। দেবী পার্বতী দেবতাদের অনুরোধে দুর্গম অসুরকে বধ করেন তাই দেবী পার্বতী দুর্গা নামে অভিহিত হন।

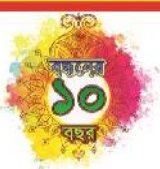
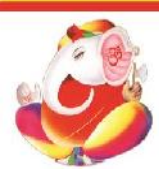
দুর্গার আরাধনা সমগ্র বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা, ঝাড়খন্ড ও বিহারের কোনো কোনো অঞ্চলে প্রচলিত। ভারতের অন্যত্র দুর্গাপূজা নবরাত্রি উৎসব রূপে উদযাপিত হয়। বছরে দুইবার দুর্গোৎসবের প্রথা রয়েছে - আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে শারদীয়া এবং চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে বাসন্তী পূজা। সম্ভবত খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলায় দুর্গোৎসব প্রবর্তিত হয়। জনশ্রুতি আছে, রাজশাহীর তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ প্রথম মহাআড়ম্বরে শারদীয়া দুর্গাপূজার সূচনা করেছিলেন। কূর্ম, মৎস, বরাহ, দেবীভাগবত পুরাণ অনুসারে ঋষি মতন্ড কুমার কার্তিক ও গণেশ কে প্রসন্ন করেন যে তাদের মাতার নাম দুর্গা কেন? তাঁরা বলেন, হিরণ্যাক্ষ পুত্র রুরুর বংশধর দুর্গম সমুদ্রমন্ডনে অসুরদের সাথে ছলনা করার প্রতিশোধ রূপে ব্রহ্মার কাছে বর চায় যে, তাকে এমন এক নারী বধ করবে যে অনাবদ্ধ কে আবদ্ধ করে। দুর্গম অসুর চতুর্বেদীকে হস্তগত করলে সৃষ্টির ভারসাম্য রক্ষায় দেবী পার্বতী একদশ ভুজরূপী মঙ্গলময় দেবীরূপে আবির্ভূত হন। তারপর অসুরকে শূলের আঘাতে বধ করেন। কিন্তু ভাবপ্রবণ বাঙালি হিন্দুগন মহিষবধিনী চণ্ডীকে ও দুর্গমনাশিনী দুর্গাকে এক মূর্তিতে প্রতিষ্ঠা করেছে।

লেখার প্রেক্ষাপট তৈরী করতে উপরে বর্ণিত ধার করা কথা বাদ দিয়ে এবার নিজের কিছু কথা বলে শেষ করবো। একজন বিজ্ঞান-মনস্ক মানুষ হিসেবে

বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ প্রমুখদের আর্ঘ্যবন্দনা খুব একটা আমলে না নিলেও মঙ্গলকাব্যের রচয়িতাদের সুদূরপ্রসারী চিন্তার প্রশংসা না করে পারা যায় না। তাঁরাই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন লেখ্যরূপ অপেক্ষা বস্তুগত রূপ সহজে অনুধাবনযোগ্য। তাই তাঁরা ধর্মে লিপিবদ্ধ কাহিনীগুলোর দৃশ্যায়ন করেছেন মূর্তিপূজার মাধ্যমে, ফলে এখনও আমরা ধর্মের বই না পড়েও ধর্মের মাহাত্ম্য সম্পর্কে কিছুটা জানতে ও বুঝতে পারি। আমরা হিন্দুদের কতজন নিয়ম করে ধর্মের বইসমূহ পড়ি? আমার বিশ্বাস সেটা হাতেগোনা সামান্য কিছুই হবে। কিন্তু এই প্রতিমা উৎসব থাকায় আমরা ঠিকই নির্ধারিত তিথিতে সবাই একসাথে জড়ো হয়ে ধর্মীয় বিভিন্ন উৎসব পালন করে থাকি। তাই বলা যায় এই মূর্তিপূজাই হিন্দুধর্মকে এখনও টিকিয়ে রেখেছে। তাছাড়া মূর্তি, অর্থাৎ বস্তুগত বিষয় দিয়ে ধর্মের মাহাত্ম্য সহজবোধ্যভাবে সর্বসাধারণের মাঝে যে বিলিয়ে দেওয়া যায়, তা হালের সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেইসবুকে আমাদের কার্যকলাপেই প্রমানিত হয়। আমরা দেখেছি যে, যদি কেউ ফেইসবুকে একটা স্টাটাস দেয়, তুলনামূলকভাবে অধিক চিন্তা শক্তি সম্পন্ন কতিপয় মানুষ ছাড়া অধিকাংশই সেটা পড়ে না। পক্ষান্তরে যদি কেউ তাদের নিজেদের ছবি ফেইসবুকে আপলোড করে, সেখানে মহানন্দে লাইক-কমেন্টের ধুম পড়ে যায়! অর্থাৎ, সৃষ্টির সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি মানুষের আগ্রহ বেশী, কারণ তা সহজবোধ্য ও বিশ্বাসযোগ্য এক্ষেত্রে নিজের মেধা ব্যয় করে কষ্ট করে তা অনুধাবন করার প্রয়োজন হয় না। তাই ধর্মের বাণী সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছাতে হলে মূর্তির মতো দৃশ্যমান মাধ্যমেই তা বয়ে নিয়ে যেতে হবে, আর সেটাই অধিক যুক্তিযুক্ত পথ।



Drawing By: Dr Niti Nova Debnath





The Beach Day!

-Dipannita Saha (9 years old)

The beach!

It was a sunny morning, Mia and Lilly were going to the beach with their parents. It was their very first time.

Swimming in the ocean!

They got out of their car and ran to the ocean but before One step the lifeguard said there were sharks in the ocean. They went to the light house and counted them all but they were bored, so they prayed to God to make all the sharks go away. And then the sharks got really scared of something and then went away. They were surprised that the sharks were gone.

Eating ice-cream!



They both heard the ice-cream truck and asked their parents for money as they never got ice-cream from an ice-cream truck. Their parents gave Mia and Lilly \$5 each. They both spent \$4 for ice-cream and used \$2 for a blue bucket.

Collecting shells



They filled the blue bucket with shells and 1 starfish. They also saw a crab in the bucket and it pinched Mia. They went home and she felt better and had a great day at the beach.

Lost and Found

-Prithul Bisshay (12 years old)

“Where IS IT” I exclaimed. I’ve been searching for this darn thing for an hour!

I looked through the entire house, the bathroom, the kitchen, under the couch and I think I entered hell just to find my glasses. Worst thing? It’s moving day. 2 hours until my parents wake up and we start moving stuff, at that point, my glasses would’ve gone to who knows where. So, I keep looking. I double checked some places and checked the laundry. Did I leave my case in my pocket? Or were those my earphones?.. I searched through the never-ending piles of laundry looking for the pair of jeans I wore yesterday and after 30 minutes of searching, I managed to find the void but

not my jeans. 1h and 30mins left to find them, and things weren’t looking good. I checked my room next, hoping for 2 things. 1: I find my glasses resting on the table or I find my jeans which then have my glasses in them. I looked on the rack where I put my clothes. There it is! My jeans! I searched them and find... nothing. Great. I checked under the bed with my phone’s flashlight. Nada.

I am running out of time.

1 hour left. I started looking through the living room. Under the couch, in the tv stand, I even checked the bookcase. Nada, nothing, nope.

Kitchen again, I searched through the cabinets, under the sink, in the FOOD. Still couldn’t find it. I really couldn’t find it. I checked the backyard, cause why not? No frame or lens glint in sight. I went outside and remembered to check the time. My watch said it's 7:40. Great, twenty minutes left. I went outside, not really knowing what to look through, but then I remembered the car. I sneaked into my parents’ room and stole the car keys. I retreated from the room silently and rushed out the door. Time is of the essence, and I was running out of essence. I searched through the seats, trunk and other areas. Still, nothing. Well, isn’t this fantastic. 10 minutes until my parents wake up and we start moving, and still nothing on my glasses. How am I supposed to see what is what when everything is hard to see? Go on, you tell me! I bought those yesterday, for \$700! How do I keep forgetting where everything was?

BE BE BEEP. BE BE BEEP

Oh no.

That was my mums alarm clock. Before I get a chance to do anything, she sees me.

“We-ell, you’re up early.” She said, leaning against the wall in her pink pjs.

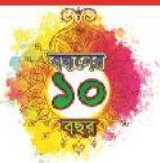
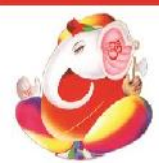
Ugh, I hate when she does that.

“Hey, have you seen my glasses?” I asked. This was my last chance to find it.

She was silent and had this look of utter disappointment in her face, and I was wondering why.

“You are... wearing your glasses” she said. I sense disappointment.

“Oh.”





The Haunted House – Just the Beginning

-Elora Galib (9 years old)

It was midnight. At my house everyone was asleep, everything was dead silent. Suddenly the grandfather clock chimed 12 times “Ding Ding Ding..... Ding!” Then the phone rang “Crrrrrrrrrrrrriing!” I forced my over-tired body up and off my bed. “Seriously who would be calling at this hour?” I thought grumpily. I was having a wonderful dream of me scoring top marks in my upcoming test with my nanny, Ms Lily.

When I reached the end of the hallway, I wondered why nobody else had answered the phone I finally picked up the phone and whispered, “Hello?!” But nobody answered. So, I tried again but this time more boldly and confidently, “Hello?!” But still nobody answered. I lost my cool and blurted into the phone, “That’s it, do you think I enjoy being called in the middle of the night and it ends up to be a prank call!”

Just as I was about to put the phone down a strangely familiar but not easily recognisable voice cackled, “Meet me at the haunted house or else.”

“Or else what?” I parroted. “Geez a prank caller at this hour.” I muttered to myself as I half sleepwalked to my bedroom, “How ideal.” Little did I know this was not a prank and that the call was being monitored by someone. “Should I be worried?” I thought secretly.

The next morning dawned bright and early. I was woken by the sound of my elder sisters Chloe and Cheryl waiting for breakfast and chatting away. I flung on my purple dressing gown and aqua slippers and slid down the stairs, onto the second floor where the dining hall and kitchen were located.

My sisters were on the balcony when I climbed onto a stool facing the island bench top. “What took you so long, Cha?” Chloe asked. I didn’t answer but then noticed a concerned look forming on Chloe’s face “Just a bit tired,” I replied, forcing myself to yawn so Chloe wouldn’t react.

“Okay if you say so,” she said, looking and sounding far from convinced. The awkwardness was broken by my mother skidding down the hallway.

“Morning kids,” she said brightly. She hesitated and then announced, “I think that we should have waffles with cream and ice cream.”

“Morning Mum,” all three of us chorused in unison.

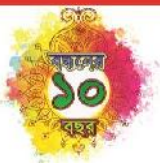
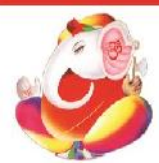
“Oh, Charlotte are you OK? You look a bit pale,” Mum asked and then said. “Ms Lily will be meeting you at the fifth floor. You will be on your own, as I have some business to attend to. Cheryl is going to university and Chloe will be at her friend’s house. Though I could cancel because you seem like you are sick and don’t think I should leave you. Lunch is in the fridge and Cheryl and I should be back by 1 am but Chloe should be back around bedtime. Please call me if you do not feel well,” she chattered. “Maybe next year I will find a school,” Mum thought aloud. Then she muttered something under her breath. “What was that Mum?” I asked.

“Nothing Cha” she managed a wink at Chloe and Cheryl which I missed and with that she set about making breakfast.

After breakfast I happily but tiredly scampered up the stairs and met Ms Lily just as I was told. The day passed in a blur although it was a bit of a workout to get lunch – I got a bit lost. Sure enough, I had finished all my lessons and was tucked up in bed reading my book, *Alice Miranda Holds the Key*, and hoping that the call last night was just a dream. Soon my eyelids grew heavy and refused to stay open any longer and, before I knew it, I had drifted off to sleep.

By the time I awoke it was 11.30 pm. I slipped on my dressing gown and slippers and, as quiet as mouse, I tiptoed down the stairs. When I reached the kitchen, it was 11.35 pm. I wondered how I was going to get to the haunted house at Ponsonby terrace. I decided that I was going on foot and calculated that it would take me 15 minutes. At 11.45 I set off going against every instinct in my body, but curious to know more. I reached the haunted house at 12 o’clock on the dot. My heart was hammering inside my chest. This was it. This time I was very sure this was not a prank.

Before I could help myself, I knocked on the cobweb covered door and it slowly creaked open. I stepped inside not knowing what to expect. The house looked strangely familiar like I had seen it in one of Cheryl’s old photographs. My nose wrinkled as there was a strong scent of old cabbages in the house. I followed a





dim, eerie light and found myself in what looked like a living room.

Inside the room there were two purple twin couches wedged in the left corner. Beside the couches there was a huge magenta ottoman. At the front of the living room there was a Sony TV and a glass chandelier was hung in the middle of the ceiling. Directly below it was a marble table which had two mugs filled with some cloudy liquid. I sat down and inspected the cloudy liquid which smelt like coffee that had been abandoned for at least 20 years, then something caught my eye: a few drops of red liquid. “Blood?!” I whispered. I was about to pull my phone out of my pocket when something heavy hit me. What was it? A trophy? A watermelon? The statue of liberty? Then I was out cold. Next thing I knew I had woken up with my hands tied to a chair in a stinky, cold room, that I could make out to be a dungeon. I could hear soft, light footsteps, and saw a figure like a man. The figure was holding something gold and key shaped. He turned it into a lock and popped the object in his pocket, and swiftly walked over to me. Now I could see him clearly.

The man had pale peach skin, he wore a three-piece black suit, black sneakers, and a matching black hat. Dark tinted sunglasses and a balaclava covered his face but not enough because I could still see his face. “Give me back what you have of mine and I will cut you free!” he snarled through gritted teeth.

There was something familiar about him. That’s when a painful memory shot into my head like a bullet. He was the man who stalked me whenever I was out of the house. He was the one who taught at the school across from my house, and he was the man who offered to carry my bike for me when I fell down! Wherever I went or looked he would be there! I shivered but not from the cold. “I don’t know what you’re talking about.” I said.

“I don’t know what you’re talking about,” he mocked me and sneered.

“Please you must believe me,” I tried again, almost crying.

“Why would I believe you? You are very smart and soon I will DESTROY you and I mean that sincerely,” he said. With that the man pulled out a pocketknife and began to cut me free. I howled in pain as the man cut my hand very deeply.

Soon I was free, but the man was gone. I ran to the door but it was locked, my mind was racing. What had just

happened? Maybe this was all a dream. Suddenly all I thought about was getting out of there and ... POOF! I had just teleported. “Woah!” I exclaimed. Now I was outside the locked door which was outside the dungeon. Then I felt faint. Overwhelmed, I fainted.

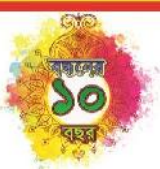
At 1am Cheryl’s car drove to the haunted house. Cheryl made her way inside the haunted house. She used to play here when she was little and knew this place like the back of her hand. The owners died tragically on Halloween one year ago and ever since then the house has been left untouched. Cheryl looked at her phone which pinged as she got a text from Chloe. “Found her,” the text said. Cheryl sighed relief and began to write to her mother.

Meanwhile, in the haunted house’s dungeon, Chloe had found Charlotte unconscious. All Chloe had to do was to wait with Charlotte until Cheryl arrived.

Cheryl had arrived just after 1.05 am to find Chloe hovering over Charlotte and, to her relief, Charlotte wasn’t badly injured at all. In fact, apart from her deeply cut, blood covered hand, she was just fine. Cheryl bandaged up Charlotte’s hand and drove home. When Cheryl and Chloe got home, they tucked Charlotte into bed and waited for a text to come. “Good work agent 303 and 333. Remember, Charlotte must never know until she is ten. This is to be kept a secret. Go to sleep now get some rest,” the text read.

Charlotte woke up confused as ever. She soon realised that her locket was what the man was after. But why? Was last night even real? She looked at her bandaged hand. Charlotte didn’t remember bandaging it. Oh well, maybe she did. Charlotte still couldn’t believe that she had teleported. She had disappeared and then reappeared in front of a door. Charlotte vowed to keep the locket out of sight.

Every night Charlotte would question herself. Who was he?





The Squabble

-Irfan Galib (Leo) [Year 1]

Once upon a time there were two siblings called Flora and Vishal. They were very good friends and they loved playing table tennis. On 19th of November they had a squabble about who's turn it was to serve.

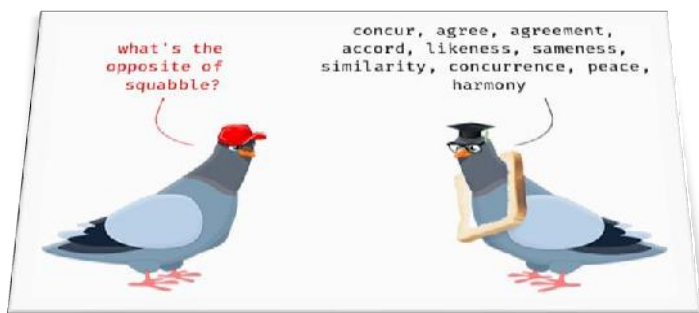
The two siblings then squabbled and squabbled and squabbled until it was night. Their parents thought they could not squabble anymore because they were rooms apart. But they shouted through the walls and continued to squabble.

They squabbled until 17th December. The day after, on the 18th of December, the parents flew to two different countries! The mum flew to Russia and the dad flew to Brazil. They left the children there for two weeks to teach them a lesson.

The kids spent Christmas alone, feeling sad. The parents went to Brazil and Russia in the new year to bring them home. In the airport the kids started to argue again. The parents then said if you haven't learnt your lesson, we will have to put 75 layers of jackets on you and send you to south pole. You will be there for 20 years.

The kids spent some time thinking quietly and then realised they will miss many family events, graduations, and birthdays if they do not learn how to get along. They thought about all the nice things they would miss out on. So, from that day onwards, they apologised to each other and to their parents and they hardly ever squabbled.

The end.



Moving

-Joyoti Sarker (8 years old)

One sunny afternoon Lily and her best friend Sophie were sitting under a tree, they call the BFF tree. They were at school talking while eating lunch and then suddenly hung her head and put a frown on her face. Lily saw Sophie, realising that she looked sad, and asked her what was wrong. "I'm moving houses," Sophie mumbled sadly. "Oh, where are you moving to?" Lily asked. "I don't know yet, but I'm moving next week." "Does that mean you have to move schools?" "Yes, it does". "Aww, why do you have to move?" "My mum got a new job." said Sophie.

A few days later Lily went to say goodbye to Sophie. When Sophie left Lily was very sad. A few days later Lily's mum said they were moving too, and Lily busted into tears. She said she had already lost her best friend and now she would lose all her other friends too.

When Lily went to her new school, she was very shy, and she sat alone at lunch and recess. She didn't even look at anyone. When she went home she started crying and her mum asked her what was wrong, and she said she didn't know anyone and her mum asked if she had even saw or talked to anyone, she said no.

Her mum told her to talk to people and see if you like them. The next day Lily went to school and then at lunch time when she was eating lunch, she bumped into somebody familiar. "Oh, sorry," Lily muttered quickly still looking down. Then she felt someone's hand on her shoulder.

"Lily?" questioned Sophie.

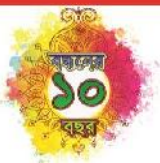
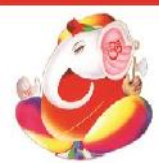
"Sophie!" exclaimed Lily.

"Lily!" Sophie cried back.

"What are you doing here?" asked Sophie.

"When I moved, I was really sad but now I found you!" said Lily happily.

When Lily went home, she squealed and told her mum about her day while still squealing and she asked if she could invite Sophie over to play. The next day Sophie went to Lily's house and they played all day.





Mopoke - The Owl

-Promiti Sarker (12 years old)

The owl sleeps quietly in its tree,
Rabbits creeping by.
But when the sun goes down,
And the stars come out,
It's time to fly up high.

"Mook pook," the owl calls twice,
"Mook pook!"

It glides over the dense, green forest,
Wings spread wide and held strong,
Its beady eyes searching the ground.

Soaring silently above the trees,
The owl spots a meal.
The goomalling, the place of possums,
Not bearing the slightest caution,
The perfect dinner to steal.

It swoops across the trees,
Brown and grey like the bark
And just as the possums come within reach
The owl's wide eyes spot something else-
People hunting for dinner.

"Mopoke! Mopoke!" the hunters shout,
Sprinting hard to catch the owl.
"Mook pook!" the owl calls again,
This time louder,
And soars back into the night.



Drawing By: Promiti Sarker (12 years old)

হে অনাগত সময়

-ডাঃ মখদুম আজম মাশরাফী

হে উৎসব দিন, হে আসন্ন কাল, হে অনাগত সময়,
তোমা পানে উদগ্রীব প্রত্যাশিত এই আনন্দ হৃদয়।
পরিপূর্ণে ভর এই জীবন কলস খানি মধু ও সুধায়।
বিগত দিনগুলো অতীত হয়েছে যত অযত্ন সঞ্চয়।

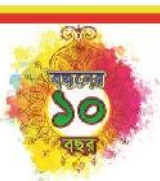
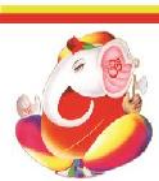
আন আবাহন দিন, সুখময় রোদদুর, শান্তি জ্যোৎস্না ঢল,
চরাচর উদ্ভাষনে অবমুক্ত কর ঐ নিস্বর্গ নিটোল।
মানবের অন্তর ভরে দাও আজ তুমি দেবদূত গুনে,
যুদ্ধ, হিংসা, শংকার শেষ কর, সুখ দাও বুনে।

আর কোন দ্বিধা নয়, মিথ্যা নয়, অহংকার নয়,
এক মনে, এক দেহে, বাঁচি সবে ভালবাসা হোক প্রত্যয়।
সীমানা ও ব্যবধানহীন এই হোক ঐক্য গ্রহবাস,
বিষবাস্প মুক্ত অব্যাহত দিগন্তে নেই শুদ্ধ নিশ্বাস।

যেন ফিরে বলা যায় বছরটি ছিল এক মানব বসতি,
বেহেশতী সৌরভময়, মঙ্গল বিনিময়, নেই কোন ক্ষতি।



Drawing By: Joyoti Sarker (8 years old)





আমার দুর্গা

-বুলু রানী ঘোষ

আলো ঝলমল দুর্গা তোমার
 আমার দুর্গা রক্ত মাংসের,
 কাঁখে শিশু হাতে হাতুরী
 আমার দুর্গা ছিন্ন বেশের ।
 পুন্য তিথির পুন্য লগ্নে
 তোমার দুর্গা আসে,
 আমার দুর্গা ঘুরছে দেখে
 নিত্য চারিপাশে ।
 আমার দুর্গার আওয়াজ শুনি
 বারবনিতার শিৎকারে,
 আমার দুর্গা গুমরে মরে
 ধর্মিতাদের চিৎকারে ।
 দুর্গা আমার রনরঙ্গিনী
 সওয়াল করে এজলাসে,
 বলসে ওঠে দুর্গা আমার
 নষ্ট ছোঁয়ায় ভীড় বাসে ।
 অস্ত্র হাতে বিকট ভীষন
 সেবার মন্ত্র সাদা কোটে ।
 শীর্ণ শরীর, কম মজুরি,
 খিস্তিখেউর তার ঠোঁটে ।
 আমার দুর্গা পন্য তোমার
 লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশনে,
 লাস্যময়ী নাইট ক্লাবে,
 দুর্গা এখন অকশনে ।
 তোমার দুর্গা আসন পাতে
 মন্দিরের ঐ জাক জমকে ।
 আমার দেবী খাবার কুড়ায়
 আস্তাকুঁড়ের বন্ধ পাঁকে ।
 আমার দুর্গা ঝড় তোলে ঐ
 কী- বোর্ড আর মাউসে,
 দুর্গা আমার চলছে ছুটে
 কারখানা, বায়িং হাউসে ।
 রান্না ঘরের চুলার পাড়ে
 আমার দুর্গা পোড়ে,
 যৌতুকের শিকার হয়
 দুর্গা ঘরে ঘরে ।
 লম্পটের এসিড মুখে
 দুর্গা আমার যোঝে,
 বৃদ্ধাশ্রমে ঘোলা চোখে
 পুত্র কন্যা খোঁজে ।
 আমার দুর্গা, আমার মা
 আমার কন্যা, জায়া,
 লড়তে জানে, গড়তে জানে
 ছড়িয়ে অসীম মায়া ।

দুর্গতিনাশিনী

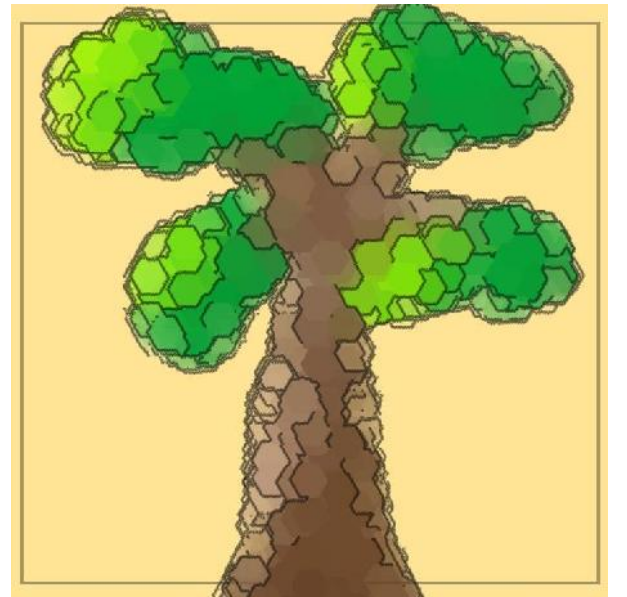
- দীপ্তি কনা রায় চৌধুরী

মা-
 মা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী
 অপরূপ তোমার রূপ
 দশভূজে অস্ত্র নিয়ে তুমি
 সেজেছো স্বরূপ ॥

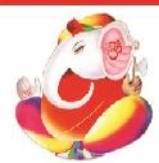
তুমি মহামায়া-
 মহিষাসুর মর্দিনী; ত্রিনয়ন ধারিণী
 বিরাজ বিশ্ব ব্যাপি
 শান্তি প্রদায়িনী ॥

তুমি মঙ্গলময়ী-
 ত্রিভুবনের মা ;
 ভক্তাঙ্গণ্য'র ডাকে সাড়া দিয়ে-
 ঘোচাও যত দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা ।
 ভক্তের আবাহনে- তোমার আগমনে
 ধরায় ফুটে উঠে শরতের
 শিউলী, কাশফুল ;
 সুবাস গন্ধে তোমার পরশনে
 ধরিত্রী সাজে মায়া রূপ ॥

রূপশ্রেষ্ঠা মাগো-
 তোমার শ্রীচরণ যুগলে
 এই প্রার্থনা করি-
 শক্তিরূপে বিরাজিত হয়ে
 অশুভ করোনা মহামারী থেকে
 মুক্ত করো এই ধরণী ।

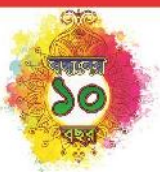


Drawing By: -Prithul Bisshay (12 years old)



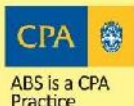


Drawing By: Dr Niti Nova Debnath





TAX Returns Company Audits GST/BAS Preparation



*Special deal
new clients* **4**

*Call for a quote
08 9470 3560*

Morshed Hasan **CPA**

ATLAS BUSINESS SOLUTIONS Auditors & Accountants Australia

461 Albany Hwy, Victoria Park, WA- 6100.
PO BOX 26, PARKWOOD, WA 6147
Tel: 08 9470 3560 (W), Mob: 0474 154 695
E-mail: h.morshedul@atlasbusiness.com.au
www.atlasbusiness.com.au

- We are offering you first consultation free, 10% discount for new clients, best quality services*
- We are providing you personalised services.
- Once you become our client you will get free consultation for future*.
- We are providing advices to grow your business as well as your wealth.

*Conditions apply

Our Services:

Tax Returns for

- > Company, Trust, Partnership, Personal
- > Self managed superfund
- > Rental Property tax

GST/BAS Preparation

- > Bookkeeping/Payroll
- > Formation of Trust/Company/SMSF
- > Tax advice/Tax strategy to minimise tax liabilities
- > Business consultation/advice
- > Superannuation strategy to save tax

Auditing & Assurance

- > External & internal audits
- > Public company and other company audits
- > Not for profit organisation audits
- > Charities and incorporated association audits
- > Real estate & settlement agent trust account audit
- > Motor vehicle dealers trust account audits
- > Strata title and outgoing audits
- > Franchise audits
- > Schools and Universities accounts/funds audit
- > Self managed superfund audit

- Find a suitable business structure that suite you
- Investment property consultation
- Business Tax Planning
- Financial Accounting and reporting
- Fringe Benefit Tax (FBT) calculation
- Our experienced team members are highly dedicated for client and having more than 10 years work experience in accounting industry.

**We use advanced tools & techniques
to minimise tax liabilities**

**Special Offers
for New Clients**





অঙ্কুরিত বিশ্বাস

-মলি সিদ্ধিকা

সব কথার ইতি যেখানে
সেইখানেই কি তোমার বাস?
শান্ত এক দীঘির পাড়ে
পদ্ম পাতার ডগার পড়ে
ঝিঁঝিঁ পোকাকার অবসরে
বাঁশের বাঁশির করুণ সুরে

আবার যেন ব্যস্ত নীড়ে
ডজন খানেক লোকের ভিড়ে
তেমনি যেন একা করে
জলরঙে আর তেলরঙে
কখনো যেন বইয়ের তাকে
এলোমেলো কাপড়ের ভাঁজে
ছেঁড়া ওই চপ্পল খানায়
মরচে পড়া টিনের মগে

শখের ইলিশ আর পোলাও এর চালে
বৌ খুদ দিয়ে বেগুন ভাজা
বৃষ্টি-বিকেলের ঝালমুড়ি-চা
কখনো আবার লুচি-পরোটা
প্রিয় বুঝি ওই জলপাই-ডাল
সজনে ডাটা আর পুঁই-পাতা

সব কথার ইতি যেখানে
সেইখানেই কি তোমার বাস?
নাকি নতুন জন্ম, আবার নিঃশ্বাস!
অঙ্কুরিত বিশ্বাস
ছুটে চলা অবিরাম
ছুঁয়ে দেয়া শত প্রাণ
নাকি কেবলি ছায়া
অথবা বর্ণচোরা
ভালোবাসার ফল্লুধারা!!



দুটি কবিতা

-অনুরাধা মুখোপাধ্যায়

প্রতিবিশ্ব

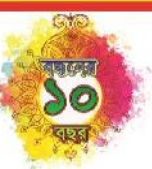
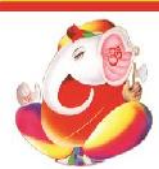
আয়নাতে কে ও
ক্লান্ত মুখের বলিরেখা গুলি
কিছু বলছে কি
তোমায় ডেকে
চোখের চাউনীর
সেই স্বপ্নীল মাদকতা
হয়েছে বিলীন
ওষ্ঠের মধুর হাসি
আজ শ্রিয়মান যায় কেঁপে কেঁপে
মেঘকালো চুলগুলি কালো দিঘীর
শ্রোত হারিয়ে হয়েছে ধুসর
শুধু মন বলে
চলো নবীন
এগিয়ে আরো
মোছো কাজল রেখা
স্বপ্ন দিয়ে সাজাও
আগামী দিন
তারপর একদিন
হও বিলীন
পরম শূন্যে

একটা ভুতের গল্প

কি করি কি করি কোথায় যাই
ঠ্যাং দুলানোর
গাছ কোথায়
ওরে খুঁজে না পাই
আমি এখন
কোথা যাই?

তেঁতুল তলার মোড়ে
আমার তেঁতুল গাছে
বাজ পড়েছে
গাছ যে গেছে মরে
এখন আমি
কোথায় যাই?

ঘোষাল পাড়ার
রায় বাড়িতে আম বাগানের মাঝে
মগডালেতে ঠ্যাং ঝুলিয়ে
গান ধরেছি সবে
হুতুম প্যাঁচা হুমহুমিয়ে
করলো যে গো তাড়া
আমি হলাম ঠাই হারা
এখন কোথায় যাই?





শেষ আশা এই চিলেকোঠার
ভাঙ্গা গুদাম ঘর
সব করতেছে লড়ঝর
বেশ আয়েশ করে
ঠ্যাং বুলিয়ে
জলের টাক্কি পরে সবে
বসছি গা ছেড়ে
অমা ওই মেয়েটা দেখি
দড়ি গাছা ছুড়ল
সিলিং পরে
আর পড়ল ঝুলে
ফ্যানের গা ধরে
এখন আমি
কোথায় যাই?

দিবির আছি এই তো আমি
অদ্ভুতের আলোছায়া
প্রদীপ জ্বালা এই ঘরে
সঙ্গী একটা ইঁদুর ছানা
সে আমাকে ভয় পায়না
আর আছে এক মূর্তি শুধু
আপনমনে এক কনে
কেউ আসেনা সারাদিনে
আছি আমার নতুন বাসায়
দিবির আছি ঠাকুর ঘরে
অদ্ভুতের এই আমি

মহা-উৎসব

-খলিলুর রহমান

হৃদয়ের গুচিতে সব গ্লানি মুছিতে
হোক আজ জীবনের মহা-উৎসব
উঁচু-নিচু জাতিভেদ ধুয়ে মুছে মনোক্লেশ
গীত হোক মানুষের জয়-কলরব
হোক আজ জীবনের মহা-উৎসব।

মন্দির, মসজিদে গির্জা ও শত হুদে
গায় এক সংগীত - মানুষ অক্ষুদ্র
মিলনের মোহনায় সবে আজ মিশে পাই
মনুষ্য-ধর্মের এক মহাসমুদ্র।
মরীচিকা ঘুঁচে যাক সত্যি যা বেঁচে থাক
দিকে দিকে নেচে যাক অন্তর-বৈভব
হোক আজ জীবনের মহা-উৎসব।

সাদা কালো বাহিরে ভিতরেতে নাহি রে
সুখ, দুখ, বিপদে কোনো পার্থক্য
একই মহা-দৃষ্টা সবারই তো শ্রুতি
একই জাতি মানুষের হোক মহা-ঐক্য।

ঈদ, পূজা, ক্রিস্টমাচে মানুষের মনে নাচে
একই শ্রুতির তরে একই অনুভব
হোক আজ জীবনের মহা-উৎসব।

ধ্বংসের ভ্রান্তিতে কেউ নেই শান্তিতে
দিকে দিকে বাড়ে শুধু আতের ক্রন্দন
শান্তি তো আসে না কোন মনই হাসে না
নাই যদি আসে আগে হৃদয়ের বন্ধন।
হৃদয়ে হৃদয় বাঁধি একসাথে হাসি কাঁদি
মিলে মিশে আজ থেকে এক হই সব
হোক আজ জীবনের মহা-উৎসব।

নারী আছে তাই

-খলিলুর রহমান

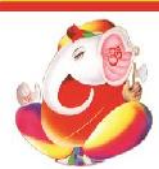
মন্দিরের দেবতা ও পূজারীকে নিত্যদিন সেবি
বড় অবহেলায় কাঁদে নারী - সত্যিকার দেবী।
মন্দির ছেড়ে যদি একদিন আসে তারা বাইরে
দেখা যাবে জগতের কেউ আর মন্দিরে নাইরে।

ছিন্নবসনা রাঁধুনী নারীর চোখে রাতে নেই নিদ
ঈদের আনন্দে তাই হাসে প্রাতে ইদগাহ-মসজিদ।
সেই নারী ঈদের রাতে যদি দিত ঘুম
ধার্মিক পুরুষের থাকতো না আনন্দের ধুম।

পৃথিবীর কোণে কোণে বছরে একদিন ক্রিস্টমাচে
ক্রুশবিদ্ধ নারীর হৃদয়ের গানে যীশু ফের বাঁচে।
চার্চ নারীর গান যদি থামে, মদ্যপ পুরুষের গানে
চার্চ থেকে যীশু নেমে ভেসে যাবে মদের বানে।



Drawing By: Sreyoshi Sen Mohor





বেঁচে থাকো

-বিরঞ্জন সূত্রধর

মৃত্যু তো আসবেই রোখা তারে যাবেনা,
মরে যাবো বাঁচি কিনা এ কথাটি ভেবোনা।
যত দিন আছে শ্বাস
ততদিন আছে আশ
মিছে মরণেরে ভেবে হা-হতাশ করোনা !!
মিছে কেন চেষ্টামেচি
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি
সব ছেড়ে যেতে হবে এতো ধ্রুব ঘটনা
মরণকে দিয়ে ফাঁকি
যত দিন বেঁচে থাকি
এসো মোরা সুখে থাকি মিছে ভয় করোনা !
করোনা এসেছে আজ
অঙ্গে মৃত্যু সাজ
দ্বারে দ্বারে কড়া নাড়ে দ্বার খুলে দিও না
এ কেমন ভাইরাস
পৃথিবীকে করে নাশ
মরলেও স্বজনেরা শেষকৃত্যতে আসেনা !
হাঁচি-কাশি যদি হয়
হাত-মুখ ধুয়ে নাও
বারে বারে হাত ধোও, সাবানটা রাখনা,
করোমর্দন আর কোলাকুলি করোনা।
যত পারো কম খাও
বাকিটুকু দিয়ে দাও
আর্ত পীড়িত মাঝে সেবা দিতে ভুলোনা।
করোনাতো চলে যাবে লিখে তার কাব্য
এর পরে কিষে আছে জানে তাহা ভাগ্য,
পৃথিবীতে কোথা কবে
চিরদিন বেঁচে থাকে
আমরাও চিরকাল বেঁচে আর রবোনা।
আপনাকে মেলে দাও
যত পারো হেসে নাও
প্রাণটাকে খুলে দাও বেঁধে তারে রেখোনা।
কপালে যা আছে ভাই
ঘটবে তা জানি তাই
দুশ্চিন্তার বোঝা বাহিরেতে রাখো না
সুখে থাকো ভালো থাকো
বেঁচে থাকো - মরার আগেই মরোনা !!!



প্ররোচিত

-ডাঃ আমেনা বেগম ছোটন

আজ ইভিনিং শিফট এস আই তৌহিদের। ৬ মাস হল এই মফস্বলে পোস্টিং।
এক কাপ রঙ চা খেতে খেতে ফাইল গুলি দেখছিল সে।

এমন সময় কস্টেবল দুলাল এক যুবককে নিয়ে প্রবেশ করল, স্যালুট দিয়ে
বললো, সার, এ সারেরগর করতে চায়, ডিগ্রী কলেজের রুপার হাজবেন্দ।

তৌহিদ আগ্রহ নিয়ে তাকাল। দুদিন আগে এখানে একটি আত্মহত্যার ঘটনা
ঘটে। শশুড়বাড়ি তে গৃহবধুর আত্মহত্যা। প্রাথমিক তদন্তে সুইসাইডের
সত্যতা নিশ্চিত হয়েছে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। পাড়াপ্রতিবেশিরা
মিলেই দরজা ভেংগে লাশ সিলিং এ ঝুলন্ত পায়। কোন সাইন অফ স্ট্রাগল
নেই। ক্রিমারকাট সুইসাইড, পোস্ট মর্টেমেও ডেথ বাই হ্যাংগিং পাওয়া
গেছে।

ঝামেলা শুরু হয়েছে মেয়েটির কলেজ থেকে। সোস্যাল মিডিয়াতেও হেঁচৈ
পরে গেছে। সবার ধারণা, শশুড়বাড়ির অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে
আত্মহত্যা করেছে। প্রভোকড সুইসাইডের বিচার চায়। কলেজের ছেলেপুলে
গিয়ে দুটো বাস ভেংগেছে আর একটা সিএনজি জালিয়ে দিয়েছে। এমপির
কল পেয়ে মেয়েটির শব্দের শাশুড়ি আর ননদকে গ্রেপ্তার করে থানা হেফাজতে
আনার পর পরিস্থিতি শান্ত হয়েছে। যদিও জিজ্ঞাসাবাদের পর তেমন কিছু
পাওয়া যায় নি। রূপা একটু রাগী আর অভিমানী ধরনের মেয়ে ছিল,
সংসারের খুটিনাটি বিষয় নিয়ে শাশুড়ি ননদের সাথে লাগালাগি হত, বড়
কোন ব্যাপার না। সব সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

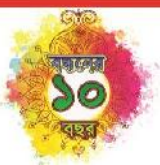
-- আপনার নাম কি? বয়স? স্থায়ী ঠিকানা? দুলাল, এগুলি ফাইলে লিখে
রুপার ফাইলে রেখে দাও। তৌহিদ বলে।

-- স্যার, আমি রায়হান, রুপার স্বামী। আমার বাবা, মা আর বোন কে ছেড়ে
দেন। তারা নির্দোষ। আমি আত্মসমর্পন করছি, শাস্তি যা হবার আমাকেই
দিন।

তৌহিদ ঞ্চ কুচকে রায়হানের দিকে তাকিয়ে রইল। প্রাথমিক তদন্তে জানা
গেছে সে ঘটনার দিন বাড়ি ছিল না, সকালেই বের হয়ে গেছিল। তাহলে
দোষ স্বীকার করছে কেন? কথা বের করতে হবে। নারী নির্যাতনকারী
লোকগুলিকে একেবারে সহ্য হয় না তার। চুরি ডাকাতি না হয় মানুষ পেটের
দায়ে করে। বউ পেটানোর মানে কি?

-- আপনার কথায় তো আসামি ছাড়া যাবে না। তাছাড়া আপনার আচরণ
সন্দেহজনক। এ দুইদিন পালিয়ে রইলেন কেন? আর ঠিক কি কারণে রূপা
সুইসাইড করল তার বিশদ ব্যাখ্যা দিন। সন্তোষজনক হলে আপনাদের
উকিল জামিনের আবেদন করতে পারবে।

রায়হান ম্লান হাসে। উকিল কই পাব স্যার? সত্যি বলতে কি, রূপা অভাব
সহ্য না করতে পেরেই গলায় দড়ি দিয়েছে। আমার বাবা প্রেসারের রোগী,
মাও দুর্বল মানুষ, বোনটার বিয়ে দিতে পারি নি এখনো - আমাদের পরিবার
টা ধবংস হয়ে যাবে। একটু দয়া করুন, স্যার।





-- সিনেমার ডায়লগ দেয়া বন্ধ করুন। থানা দয়াদাক্ষিণ্যের জায়গা না। বাড়ির বউয়ের উপর অত্যাচার করার আগে মনে ছিল না এসব? মেয়েটাকে মেরে তারপর সবাই মিলে ভালমানুষ সাজা হচ্ছে? কি করেছিলেন ঠিকঠাক বলুন আগে।

-- আমি তো সারেঙার করলামই, তারপর ও কেন আমার পরিবারকে আটকে রাখবেন? যদি টাকার আশায় এগুলো করেন, তাহলে আগেই বলে রাখি, টাকা দেবার মত সামর্থ্য আমাদের নেই, মিছিমিছি সময় নষ্ট করবেন না। পরে আফসোস--

ঠাস করে এক থান্ড পল রাইহানের বাম গালে। ঘুষের কথায় মাথায় রক্ত চড়ে গেছে তৌহিদের। আরেক চড়ে চেয়ার থেকে পরে গেল রাইহান।

-- আরেকবার বড় বড় কথা বললে জুতিয়ে চাপা ভাঙবো তোর। মিনকা বদমাশ কোথাকার। কি ঘটনা ঠিকঠাক না বললে মাইর কাকে বলে সেটা আরো ভাল করে বুঝিয়ে দেব, রাগে ফুসতে থাকে তৌহিদ। কস্টেবল দুলাল দৌড়ে আসে। এই নতুন অফিসার গুলির যে মাথা গরম, যাকে তাকে না বুঝে মেরে বসে, পরে দেখা যায় এরা লতায়পাতায় এমপির আল্লীয়, থানাশুদ্ধ পুলিশ এর ফল ভোগ করে। ট্রান্সফার হস্তিত্বি, পরের জেনুইন কেসে এর এডভান্টেজ নেয়া।

-- স্যার, স্যার আপনি বসেন, আমি দেখছি। ওই মিয়া, মিছামিছি ঘাউরামি করেন কেন? যা জিগেস করে সোজা উত্তর দিলেই তো হয়। রাইহানকে ফ্লোর থেকে উঠায় সে। তবে চেয়ারে বসায় না, মাটিতেই বসিয়ে রাখে। গোমড় না কমলে আরো ত্যাঁদরামি করে সময় নষ্ট করবে, এতে স্যারের রাগও কমে আসবে। ১৫ বছরের চাকরি, রুমের তিনজনের মধ্যে তার অভিজ্ঞতাই সবচেয়ে বেশি।

-- এই, কথা বলস না কেন? আরো মাইর খাবার শখ আছে? স্টুপিড কোথাকার।

মুখের ভেতর নোনাসাধ টের পায় রাইহান, কেটে গেছে মনে হয়, রক্ত মাথা থুতু ঢোক গিলে সে। সে হতভম্ব হয়ে গেছে, রেগে যাবার মত ত সে কিছু বলে নি। কি শুনতে চাইছে পুলিশ? তার আর রূপার সফল প্রেম আর ব্যর্থ দাম্পত্যর কাহিনী? বেশ তাই হোক।

-- আমার আর রূপার প্রেমের বিয়ে স্যার। ১ বছর প্রেমের পর আমরা পালিয়ে বিয়ে করি।

বিরক্ত লাগছে তৌহিদের, শালা ফকিরির আবার প্রেমের বিয়া লাগাইছে, এহ। মুখে বলে, প্রেম হয়েছে কিভাবে?

-- ফেসবুকে। আমি লিখালিখি করতাম, রূপা গল্প পড়তে ভালবাসত। এভাবেই।

-- তুই ফেসবুক সেলেব্রেটি? কি লেখস? ফলোয়ার কত?

-- গালি দিচ্ছেন স্যার? আপনিও তো আমার ফ্রেন্ড লিস্টে আছেন, রূপা কে নিয়ে যে গল্পটা লিখেছিলাম তাতে কমেণ্টে লিখেছিলেন অসাধারণ লিখছেন বস।

-- ফেসবুকে নাম কি?

-- বাউন্ডুলে রাইহান।

খমকে যায় তৌহিদ, এ ছেলেটা বেশ সুন্দর সব গল্প লিখত। সবার কমেণ্টের সুন্দর সব উত্তর দিত। সেই লোক নারী নির্যাতনকারী, ভাবা যায়?

-- পালিয়ে বিয়ে করতে হল কেন?

-- রূপার বাবার হঠাৎ খেয়াল চেপেছিল মেয়ে বিয়ে দিয়ে দেবে, পরের বছর হজে যাবে তাই। অবস্থাপন্ন ঘরের সুন্দরী তরুণী, সম্বন্ধের লাইন লেগে গেল। প্রতি সপ্তাহে ওকে দেখতে আসত। রূপা খুব নার্ভাস ধরনের মেয়ে ছিল, সে আমাকে বিয়ের জন্য চাপাচাপি করতে লাগল। আমি বিয়ে করতে চাই নি, বুঝেছিলাম এর ফল ভাল হবে না। রূপা জেদ ধরল, গাছতলায় থাকবে, একবেলা উপোস দিবে এরকম অদ্ভুত কথা বলত।

-- তাতেই রাজি হয়ে গেলেন?

-- অত গাধা আমি না স্যার। ওকে বলেছিলাম কোর্ট ম্যারেজ করে যে যার মত থাকি, চাকরি বাকরি হলে তখন সবাইকে জানাব। ওর এক বান্ধবী ব্যাপারটা জানত, সে রূপার মাকে বলে দিল, তারা ডিভোর্সের জন্য চাপাচাপি করতে লাগল, ও সুযোগ বুঝে বাসা থেকে পালিয়ে আমাদের বাড়ি এসে উঠল।

-- তারপর?

-- আমার মা, বাবা খুব রাগ করলেন। বাবা প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার, এমনিতেই সংসার চলে না। এরপর আরেকজনের খোরাকি, খুব বেশি হয়ে যায়। উনারা রূপাকে ফিরে যেতে বললেন, আমাকেও বললেন ওকে ওর বাড়ি দিয়ে আসতে। রূপা রাজি হল না।

কিন্তু, আমাদের বাড়ির অবস্থায়ও মানাতে পারছিল না। চেষ্টার ক্রটি ছিল না, তবুও করবে টা কি? আমি থাকতাম বসার ঘরের চৌকিতে, সেটি সরিয়ে ফ্লোরে থাকতাম। মুরগী হত মাসে একদিন, বাকি সময় মাছ, ডাল, ভর্তা কোনভাবে চালিয়ে নিত মা। দিনের পর দিন বেচারি কোন রকমে গিলত। এসব বড়লোকিপনা আমার মায়ের ভাল লাগত না, প্রায়ই বকতেন আমাদের, বলতেন তুই তোর রাজরাণী নিয়ে ঘরজামাই হয়ে যা। আমাদের রেহাই দে।

-- আপনার কোন ইনকাম ছিল না?

-- কি করে থাকবে? আমি স্থানীয় কলেজে কোন রকমে ফিলসফিতে অনার্স পড়েছি। চাকরি দূরে থাক, টিউশনি জোটাতে কষ্ট হত। ছাত্রদের বাপ মা বলত আটসের ছাত্র কি পড়াবে আর? পরে দু'হাজার টাকার একটা টিউশনি পেলাম, ছাত্রী ক্লাস থিতে পড়ে। যেতে আসতেই এক হাজার টাকা চলে যেত। উহ, কি দুঃসহ জীবন!

-- আর রূপা?

-- ও কলেজে যাবার জন্য ছুটফট করত, পড়তে চাইত। কিন্তু আমাদের কি সাধ্য তার পড়ার খরচ টানি। থিটথিটে হয়ে গেল খুব। সারাক্ষণ মুখভার করে বসে থাকত। আমি বাড়ি ফিরতে চাইতাম না, ইচ্ছে হত রিক্সা চালাই। কত ভাড়া বেড়েছে আজকাল। কিন্তু পরিচিত কেউ দেখলে কি বলবে সে ভয়ে চালাতে পারতাম না।

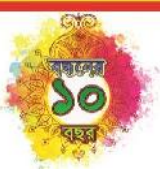
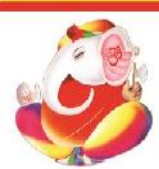
-- চাকরির চেষ্টা করতেন না?

-- সে করতেও টাকা লাগে। ছবি, বায়োডাটা প্রিন্ট কর, এদিক ওদিক যাও। তবু করতাম, কিন্তু একেকটা দিন আর পার হচ্ছিল না।

-- ঘটনার দিন কি হয়েছিল?

-- ৫ তারিখে? সেদিন কিছু হয় নি, আগের দিন কিছু টা ঝগড়া হয়েছিল।

-- কি নিয়ে?





-- দুপুরের রান্না নিয়ে। বাবা আধা কেজি শিংমাছ এনেছিল ৫০০ টাকা দিয়ে। মা সেগুলি চুলায় চড়িয়ে রুপাকে বলেছিল দেখতে, রুপা একবার দেখে ঘরে চলে এসেছিল, আমার সাথে গল্প করছিল। মা কতক্ষণ পর গিয়ে দেখে মাছ পুড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি চুলা নিবিয়ে রুপাকে ডাকল, রুপা কাছে যেতেই খুশি দিয়ে ওর হাতে এক বাড়ি দিয়ে দিয়েছে। রুপা খুবই রেগে গেছিল, মার হাত থেকে খুশি নিয়ে ছুড়ে ফেলেছিল, বললো এণ্ডবড় সাহস আপনার, আপনি আমার গায়ে হাত তুলেন।

চেচামেচি শুনে আমি দৌড়ে আসি, মা আমাকে শাসাতে লাগলেন, এফুনি এই বউ শাসন না করলে উনি আত্মঘাতি হবেন। আমার বোন এসে মায়ের পক্ষ নিল, বললো, হয় তোর বউ মার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবে, নয়ত তুই বউ নিয়ে বের হয়ে যাবি। আমি রুপাকে বললাম, মায়ের কাছে ক্ষমা চাও, দোষ তো তোমার। রুপা রাজি হল না, আমার মা বিলাপ শুরু করলেন, আমার বোন সেই সাথে যোগ দিল - এরকম অবস্থায় আমি আর মাথা ঠিক রাখতে না পেরে রুপার গালে এক চড় বসিয়ে দিলাম। ম্লান হাসে রায়হান। এই আপনার চড় টা থেকেও আশ্তে দিয়েছিলাম স্যার।

-- তারপর?

-- এরপর রুপা একদম চুপ হয়ে গেল। আমার মা তারপর ও আশা করছিলেন চড় খেয়ে রুপা হয়ত ক্ষমা চাইবে, কিন্তু ও আর কিছুই বললো না। চুপ করে ঘরে গিয়ে বসে রইল।

-- আপনি আর কিছু বলেন নি?

-- বলেছিলাম, আমাদের একটু মানিয়ে চলতে হবে, কাজকর্ম জুটলে আমাদের অবস্থা এমন থাকবে না।

-- ও কি বলেছিল?

-- অন্যমনস্ক গলায় বলেছিল, তিনটা শিংমাছের মূল্যও তার জীবনের মূল্য থেকে বেশি। বিরক্ত লাগছিল আমার, বলেছিলাম, তোমাকে কাল তোমাদের বাড়ি রেখে আসব। উনারা যা বলে তাই করো। প্রেম বিয়ে সবকিছুর শখ ত মিটেছে, এখন বাপেরবড়ি গিয়ে দুটো ভালমন্দ খেতে পেলেই তোমার চলবে। সংসারে মানিয়ে চলার মত মানসিকতা তোমার নেই। আমি তোমাদের বউ শাশুড়ির মাঝখানের টানাটানিতে পরতে চাই না।

-- তারপর?

-- সে রাতে আর কিছু খায়নি রুপা। আমি পরদিন সকালে বের হয়ে গেছিলাম, সাভারের একটা গার্মেন্টস এর ফ্লোর সুপার ভাইজারের ইন্টারভিউ ছিল, মা পাশের বাসায় গেছিলেন আমার বোন কে নিয়ে, বাবা স্কুলে। তখন রুপা গলায় ফাস নেয়। বাকিটা তো আপনারা জানেন।

-- দুদিন পালিয়ে ছিলেন কেন?

-- খবর শুনে নিজেকে আসামি মনে হয়েছিল তাই। আমিই তো দায়ী, তাই না, স্যার? মেয়েটা ভালবেসে আমার কাছে এলো, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলাম না। রুপার মৃতদেহ দেখতে সাহসে দিচ্ছিল না। সহ্য হতো না।

আমার ফ্যামিলিকে ছেড়ে দিন, স্যার। আমি যা শাস্তি হয় মাথা পেতে নিব।

-- আপনাকে হাজতে চালান করে দেব। কিছু ফাইল ওয়ার্ক আছে, সেগুলি করে আপনার ফ্যামিলি কেও ছেড়ে দিব। কিছু খাবেন? হাজতে অনেকদিন ভাল কিছু জুটবে না।

-- একটু ভাত তরকারি হলেই হবে স্যার, দুদিন কিছু খাওয়া হয়নি।

দুলালকে খাবারের ব্যবস্থা করতে বলে রায়হানের বক্তব্য ফাইলে নোট করতে শুরু করে তৌহিদ, রুপার পরিবার, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব এদের স্টেটমেন্ট ও নিতে হবে।

ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তৌহিদ। বেকার অবস্থায় তৌহিদের গার্লফ্রেন্ড হঠাৎ এক ইতালি প্রবাসীকে বিয়ে করে ফেলেছিল। অনেক অভিমান হয়েছিল তৌহিদের, আজ হঠাৎ ওকে ক্ষমা করে দিল তৌহিদ। প্রেম আর সংসারে প্রায় ইহকাল পরকালের মত পার্থক্য সেটা সে আজ বুঝতে পারলো।

করোনা এবং আমরা

-স্বর্ণা আফসার

এই লেখাটি লেখার সময়ে ৩৫ মিলিয়ন মানুষ বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত। এক মিলিয়ন মানুষ হারিয়ে গেছে না ফেরার দেশে। ভাইরাস খালি চোখে দেখা যায়না। কিন্তু কি আশ্চর্য এর শক্তি যে অতিকায় বিমান আকাশে ওড়া বন্ধ করে দিলো। জনাকীর্ণ সব নগরীগুলোতে রাতারাতি নেমে এলো শূন্যশান নীরবতা। ব্যস্ত অফিস পাড়া শূন্য, খেলার মাঠগুলোতে শিশুদের আনাগোনা নেই। সবার চোখ খবরের দিকে, কি হয় কি হয়। তারপর কি হলো?

দূরে কোথাও দূরে দূরে

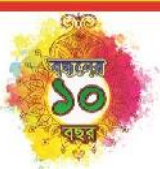
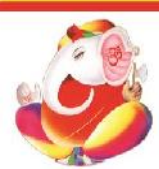
পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী পার্থ বিশ্বের সব থেকে বিচ্ছিন্ন নগরের মধ্যে একটি। দ্বীপের মাঝখানে যেন ছেঁড়া দ্বীপ। এই শহরে থাকলে আসলেই মনে হয় "এখানে বৃষ্টিমুখর লাজুক গায়ে এসে থেমে গেছে ব্যস্ত ঘড়ির কাঁটা"। এই শহরের মানুষ নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত।

প্রথম প্রথম দেশ বিদেশের কোনো খবর না পেয়ে রীতিমতো খাবি খেতাম। খবরের কাগজের শিরোনাম যদি হারিয়ে যাওয়া কুকুর, বিড়াল কিংবা শখের পুতুল হয় তাহলে ধরে নিতে হবে তাবৎ শহর বেশ সুখেই আছে। নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকা দিনে দিনে কেমন যেন আমারও স্বভাব হয়ে গেলো। সন্ধ্যারাতে আড্ডা জমানো মানুষ থেকে সন্ধ্যাকালে বোকা বাত্মের সামনে বসা মানুষ হয়ে গেলাম! ঐয়ে কথায় বলেনা "যেমন দেশ, তেমন বেশ"।

অর্জুন কৃষ্ণকে বলেছিলেন "মানুষের মনের থেকে বাতাসকে বশ করা সহজ"। কথা খুবই সত্য। মন আজকে পার্থ শহর নিয়ে ব্যস্ত থেকে ভালো, তো কাল আবার বিশ্বের কথা ভেবে, বিশ্বকে মিস করে খুব খারাপ। এই ভালো মন্দ মিলিয়ে আমরা কিন্তু পার্থে ভালোই আছি।

ভালো থাকার মাঝে মনে যে দুঃখ হয়না তা কিন্তু নয়। এই যেমন মনে করুন কোনো বড় শিল্পী আসবেন। অস্ট্রেলিয়া বলতে বাইরের বিশ্ব সিডনি শহর চেনে, কিংবা ক্রিকেটের কল্যাণে মেলবোর্ন। পার্থ কোথায় তা খুব কম মানুষই জানেন। বড় শিল্পীর উড়োজাহাজ বঙ্গোপসাগর, ভারত সাগর সব পেরিয়ে পার্থের উপর দিয়ে উড়ে পূর্বে চলে যায়। শিল্পীর গানে মন পরে থাকলেও এই শহর থেকে শিকড় বাকর গুটিয়ে ছানাপোনা সমেত হোকনা গুটিকয় দিন, দূরে যাওয়ার বাক্তি নিতে হচ্ছে হয়না। সুতরাং মন খারাপ হয়।

করোনা কালীন সময়ে ভাবনা কিন্তু অন্যরকম। এখন মনে হয় ভালো হয়েছে এই ছেঁড়া দ্বীপে শিল্পী কেন আসবেন? করোনাই আসলোনা!





যদিও মজা করে লিখছি, এই রম্য করতে পারছি ভালো আছি বলে। দূরে থেকে, সবার থেকে দূর হয়ে, নিজেদের লক্ষণরেখা বজায় রেখে আমরা ভালো আছি। সবাই ভালো থাকুন। ক্লাইভ পামারের মতো কায়েমী স্বার্থবাদী ধনীদেব দুয়োধনি দিয়ে বলছি "ভালো আছি, ভালো থেকে, আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো"।

কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর?

ছোটবেলায় বইতে যখন ছড়াটা পড়েছিলাম, এর মমার্থ আর সত্যতা বোঝার মতো বয়স হয়নি। মানুষেরই মাঝে স্বর্গ, নরক মানে কি? তখন তো দিনগুলো সব রঙিন খাতার রাংতা মোড়ানো ছিল। মানুষের সংজ্ঞা ছিল নিজের পরিবার ও পরিজন। সমাজের সবাইকে নিয়ে ভাবার মতো মাথার সাইজ ছিলোনা। যত বড় হলাম, মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠের সাথে সাথে বেদনার স্মৃতিও বাড়তে থাকলো। "আচ্ছা কেন মানুষগুলো এমন হয়ে যায়?" এই ধরুন করোনা সময়ে ঘোষণা দেয়া হলো দোকান পাটে অকারণে ভিড় করা যাবেনা। একবারও কেউ বলেনি দোকান বন্ধ হবে। স্কুল বন্ধ হবে বলেছে। অফিস বন্ধ হবে আর দোকান বন্ধ হবে বলেনি। প্রথমটা বললে আমি অবশ্য খুশি হতাম।

আবারো মজা করছি। অনেকে না চাইতেই অফিস বন্ধ হয়ে গেছে, তেমনটা ভেবে বলেনি। যাহোক গল্পের পথে থাকি, দোকানের কথাই বলি। এই ছেঁড়া দ্বীপের মানুষগুলো বোধয় আমাদের বাঙালির মতো ভোজন রসিক। বেগম রোকেয়া বেঁচে থাকলে সুলতানা কেন তাবৎ সালতানাতের স্বপ্ন লিখে ফেলতে পারতেন! করোনার জন্য স্কুল বন্ধ? আরে ব্যাস! মানুষ ট্রলি ভর্তি করে শাক সবজি, মাছ মাংস সব কিনছে। তেল, নুন, এমন কি শুকনো খাবার চাল, ডাল সাবাড়! টয়লেট পেপার নিয়ে শেষমেশ হাতাহাতি। সরকার বাধ্য হয়ে ঘোষণা দিলো যে এমন অবিরেচকের মতো বাজার করার কোনো দরকার নেই। দেশে সকলের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য আছে!

সত্যি সেলুকাস! শুধু অস্ট্রেলিয়া নয়, গোটা বিশ্বে একই সঙ্কট। আমি বুঝতে পারছি না যে এতো কিছু থাকতে কেন আমাদের টয়লেট পেপারের যোগান নিতে হবে কয়েক বছরের জন্য! হয় আমরা নিজেদের জীবন এবং খাওয়া দাওয়া নিয়ে খুবই আশাবাদী তাই ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবছিলাম জ্ঞানীর মতো। অথবা আমরা সেই আজীবন চিলে কান নেয়া মানব জাতি। কোথাও কিছু নেই শুনেই নিজের ঘর গোছাতে দৌড়াই।

এই অহেতুক গেড়াকলে দৌড়াতে দৌড়াতে আজকের বিশ্বের এই অবস্থা। আমি নিজে ভরপেট খেয়ে ঢেকুর তুলে আরাম করে থাকাই জীবন। পাশের বাড়ির বৃদ্ধ প্রতিবেশী বাজার যেতে পারেন না, তিনি খেলেন কি খেলেন না, বেঁচে আছেন কি নেই তা নিয়ে কে ভাববে? অন্যকে নিয়ে ভাবা বোধয় অনেকটা সেকেলে হয়ে যাচ্ছে। আশা করি আমরা এই ব্যাপারে আধুনিক না হয়ে সবাই খুব সেকেলে হই। ঘরের খেয়ে বনে অনেক অনেক মোশ তারাই। মানুষের কাজে লাগি, মানবতার কল্যাণে থাকি।

এই করোনাকালীন সময়ে টয়লেট পেপার ছিল সব থেকে লজ্জাকর অধ্যায়। আমরা যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক পথের সন্ধান দেই। ভুলগুলো স্বীকার করে সামনে এগিয়ে যাই ওদের হাত ধরে।

আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন

আমরা যারা তল্লি তল্লা বাস্ক পেটরা বেঁধে অনেক আশা নিয়ে ভালো থাকার জন্য, সুন্দর আগামীর জন্য একটা উড়োজাহাজে চেপে বঙ্গপোসাগরের বুকের ছোট সবুজ দ্বীপ ছেড়ে অনেক দীর্ঘশ্বাস চাপা দিয়ে উড়ে এসেছি সুদূর

অস্ট্রেলিয়াতে, আমাদের সবার সুটকেসে অদৃশ্য কিন্তু অনেক অমূল্য কিছু জিনিস আমরা নিয়ে এসেছি। আর তা হলো আমাদের প্রিয়জনদের মুখচ্ছবি, তাদের ভালোবাসার স্মৃতি। জীবন, জীবিকা, ছেঁড়া দ্বীপ, প্রতিদিন ব্যস্ত রাখে। কিন্তু ব্যস্ত শহর কখনো কখনো চোখের কোনে ভিড় জমায় সেই প্রিয় মুখগুলো আর খুব যত্ন করে রোদে দেয়া শাড়ির মতো খুব প্রিয় সেই স্মৃতিগুলো।

প্লেনে চেপে উড়ে উড়ে আসতে আসতে আমরা অনেক কিছুকে চাপা দেই, এই যেমন আনন্দের দিনগুলোতে একসাথে থাকার ইচ্ছা। কিংবা পটল খাবার ইচ্ছা। আমের দিনে আম, জামের দিনে জাম। পাট ভাঙা নতুন শাড়ি বা খোঁপাতে বেলি আর রজনীগন্ধার ফুল। সবকিছু আমরা একটু একটু করে চাপা দেই। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি চোখের আড়াল হওয়া মানুষগুলো ভালো থাকুন, আমাদের থেকে বেশি ভালো থাকুন। ফিরে গিয়ে যেন আরেকবার মুখগুলো দেখতে পাই, সবার সাথে আরো কিছু স্মৃতি গড়ার সময় পাই।

এই করোনাকালে পৃথিবীকে বিদায় বলে চলে গেছেন অনেক আপনজন। বিদেশে থেকে স্বজন হারানো মানুষগুলোর কান্না আমি দেখেছি। প্রিয়জনকে হারানোর বেদনা, হাহাকারের থেকে বেশি কষ্টকর ছিল শেষ সময়ে একবার বিদায় বলতে না পারার দুঃখ।

ছোট হয়ে আসা পৃথিবীতে এখন দূরত্বই সব থেকে বড় সত্য। টেলিফোন, মোবাইল, ইন্টারনেট, সব কিছু থাকতে আমরা দূরত্বকে অতিক্রম করে দিন-রাত পার করছি। তবু ওপারে ভেলা ভাসানো মানুষগুলোকে একবার, শুধু একবার বিদায় বলতে না পারার দুঃখ যেন অনতিক্রম্য। আপনার থেকে আপন মানুষগুলোকে হারিয়ে আমরা তাই হাতড়ে বেড়াই স্মৃতির একান্ত আপনায়।

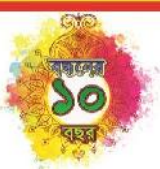
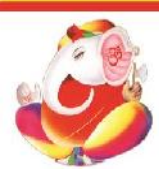
করোনাকালে জন্ম, মৃত্যু, কিংবা বিবাহ এই ত্রিশক্তি আর ত্রিসত্যির কোনটি থেমে নেই, তবে বদলে গেছে। সামাজিক ঘটনাগুলো কেমন যেন একলার হয়ে গেছে। তবে ওই গানটির মতো আমি বিশ্বাস করি "একদিন ঝড় থেমে যাবে, পৃথিবী আবার শান্ত হবে"।

তিন পাগলে হলো মেলা নদে এসে

টয়লেট পেপার, ডোনাল্ড ট্রাম্প, হলিডে ডেস্টিনেশন করোনাকালীন কিছু মনে রাখার মতো কাহিনী। তবে করোনা কিন্তু আমাদের অনেক কিছু ভাবতে শিখিয়েছে। এই যেমন মানুষের মধ্যে মানবতা এখনো বেঁচে আছে। রোগী দেখার মতো সঠিক উপকরণ নেই, আড়াল নেই, নিজের জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবু তারা সেবা করে গেছেন। মানুষকে বাঁচানোর শেষ লড়াই করে গেছেন যমদূতের সাথে। আমি ডাক্তারদের কথা বলছি।

ছোট ছোট শিশুরা স্কুল যাচ্ছে। বাবা, মায়ের ছুটি নেয়ার উপায় নেই। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিন জ্ঞান দিয়ে গেছেন সেই নিরলস শিক্ষকদের কথা বলছি। আমি মায়াকাড়া ডে কেয়ার কর্মীর কথা বলছি যারা এর মধ্যে ছুটি নিতে পারেননি একটি দিনও।

আমি বলছি পরিবহন কর্মীদের কথা, অনিশ্চয়তাকে আঁকড়ে ধরে প্রতিদিনকে নিশ্চিত করা প্রতিটি মানুষের কথা। যারা দিনের পর দিন নিরলস পরিশ্রম করে সচল রেখেছেন অর্থনীতির চক্র। নিজেদের প্রতিদিনের জীবনে আছে পরিবর্তন। অফিস পাড়ার বদলে বাসা থেকে কাজ। ঘর সংসার, রান্না থেকে ছুটি তো নেই, বরং নতুন পরিবেশের দেড়গুণ কাজ। আমি বলছি করোনা কালীন প্রতিটি সৈনিকের কথা, আমি বলছি আমাদের কথা। করোনাকালে





আমরা নিজেদের যেন বুঝতে পেরেছি। জীবনে কোন কাজটি অর্থবহ কোনটি শুধুই বাতুলতা তাও চিনতে পেরেছি।

প্রকৃতির আদিম শক্তির তিন ধরনের গুণ: তামসিক (ধ্বংস), রাজসিক (সৃষ্টি), সাত্বিক (ভারসাম্য)। তিনগুণের দরকার আছে যার যার মতো পরিমিত পরিমাণে। ধ্বংস না থাকলে সৃষ্টি আসতে পারেনা। সৃষ্টি যদি হয় সৃষ্টিছাড়া, তাহলে তা ধ্বংস না হয়ে পারেনা। করোনাকালীন সময়ে আমরা বুঝতে পেরেছি যে মানুষ নিজেদের স্বার্থে কতখানি ধ্বংসাত্মক হয়ে গিয়েছিলো।

প্রতিদিন এতো ছোট্টাছুটি, এতো ধ্বংস, এতো ভোজন, এতো কোলাহল, এতো অতিরিক্ত আহার এইসবের কতটা আদৌ প্রয়োজন আছে? গত বছর যখন আমাজনের জঙ্গল পুড়ছিল, পৃথিবীর ফুসফুস ধ্বংস হচ্ছিলো, সেই ফুসফুস করোনা কালীন সময়ে কিছুটা বিরামে যেন বিশ্রাম পেলো। পৃথিবীর দূষণ কমে গেলো।

মানুষ হিসেবে আমরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ হিসেবে দাবি করি। শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় ধ্বংসে নয়, বরং ভারসাম্য বজায় রেখে। সৃষ্টি সূত্রে উল্লাসে যদি শুধু আমরা ভোগে মত্ত হই তাহলে ধ্বংস আসবেই, আসতে বাধ্য। ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে আমাদের দরকার নিজেদের যতটুকু প্রয়োজন শুধু ততটুকুই নেয়া, তার বেশি নয়, কম ও হয়। ভারসাম্যের এই গুণ যদি আমরা সত্যি ধরে রাখতে পারি তাহলে আগামী দুর্ঘটনায় টয়লেট পেপার কেন কোনো কিছুই সঙ্কট হবেনা।

অহর্নিশ

-অয়ন চৌধুরী

আল্লাদভাঙ্গা গ্রাম পিছনে ফেলে সর্পিলা মেরোপথ পেরিয়ে উত্তরে আদরদীঘি যেতেই মধ্য আকাশে আশ্রিত শরতের পূর্ণিমার খরশ্রোতা আলোয় দেখা মেলে পথের দু'পাশে দিগন্তজোড়া কিশোরী কাশফুল মেঘের মতো বাতাসে ভাসছে। চমকিত জোঁনাকীর দল সেই কিশোরী কাশফুলের শরীর ভেদ করে উড়ে বেড়ায়। তাদের মাঝে কোনো এক কৃষক শিল্পীর হাতে লাগানো মেঘেদের সাথী সাতটি সুউচ্চ তালগাছ আদরদীঘির পাড় ঘেষে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে রূপালী আলোয় চিকচিক করা আদরদীঘির জলে ছাঁয়া মন্তুন করে প্রকৃতির উন্মাদনায় নিজে বিলীন হয়। এমনি করেই অহর্নিশ একজন লেখক বা নাট্যকারের ভাবনার এক একটি ছাঁয়া বিলীন হয় মাত্র; শেষ হয়ে যায় না সে।

মন নন্দিত হয় তখনই যখন নিজ দৃষ্টি আরোহণ করে নন্দন। তেমনি একজন লেখক তখনই নন্দিত হয়; যখন তার লেখনি অন্যের দৃষ্টি ও মনে নন্দন তৈরী করতে পারে। যেমন- সুস্মৃতিসুস্ম বালুকণারও সৌন্দর্য লক্ষ্য করা যায় আতশ কাঁচের নীচে; তেমনি একজন লেখক বা নাট্যকার তার লেখনিতে অক্ষর, শব্দ বা বাক্য নির্বাচনের মাধ্যমে দৃশ্যকল্পের সৌন্দর্য বিন্যাস ঘটাতে পারে। তাই সৌন্দর্যসাধনা একজন লেখক বা নাট্যকারের ব্রত।

ইতিহাস বা অতীত অবিকৃত। যে ঘটনা বর্তমান; সব ক্ষণস্থায়ী। কারণ ক্ষণকাল পূর্বে ঘটে যাওয়া ঘটনা অবিকৃত হয়ে যায়। কিন্তু একজন লেখকের জন্য ভবিষ্যৎ এমনই এক অনুসঙ্গ; যা পরিবর্তন পরিমার্জন করে তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে পারে। তাই একজন লেখক বা নাট্যকারকে সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হতে হয়। প্রসঙ্গতঃ একজন লেখক বা নাট্যকারের সারথী

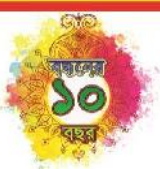
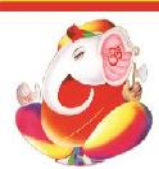
অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। এই তিন কাল একসাথে কেবল একজন লেখক বা নাট্যকার তার তৈরী করা চরিত্রের মাধ্যমে দেখতে পায়। যেমন- গল্প, কবিতা, উপন্যাস বা নাটকের চরিত্র গুলো বিশ্লেষণ করলে সহজেই অনুমেয়।

ভুল, শুদ্ধ, পাপ, পুণ্য এই চারটি শব্দের মধ্যে বিরাজ করে দর্শন। মানুষ ভেদে দর্শন ভিন্ন হলেও লেখার স্বার্থে একজন লেখক বা নাট্যকারকে গল্পের চরিত্র গঠনের জন্য চারটি শব্দের দর্শনই তাকে ধারণ করতে হয়। গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস অথবা সাহিত্যের যে কোন শাখা লেখার সমাপ্তি ঘটলে তার মাধ্যমেই নির্ণীত হয় লেখকের নিজস্ব দর্শন। যেমন- 'আমার অব্যক্ত কথার আবহ তুমি' এই বাক্যটি পাঠে লেখকের দর্শন স্পষ্ট নয়। কিন্তু 'আমার অব্যক্ত কথার আবহ সোনার বাংলা' এখানে লেখকের দেশাত্ববোধ ও দর্শন স্পষ্ট। লক্ষণীয়- যে কোন সাহিত্য রচনা কালে তা দর্শনহীন এবং পরাধীন। কেবল রচনা সমাপ্তি ঘটলেই তা লেখকের দর্শন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্বাধীন। প্রতীয়মান হয় যে, লেখক মাত্রই স্বতন্ত্র দার্শনিক এবং সে তার নিজ সাহিত্য রচনার সাম্রাজ্যে বিনয়ী সম্রাট।

আমি বিশ্বাস করি- জন্মলগ্ন থেকেই প্রত্যেক মানুষ শিল্পবোধে পরিপূর্ণ শিল্পী। একজন লেখক- ভূমিষ্ঠ শিশুর হাসিতে অথবা কান্নায় যেমন শিল্পরস খুঁজে পায় তেমনি শতবর্ষী মৃত্যু পথযাত্রী বৃদ্ধের শেষ স্পর্শেও শিল্পের প্রগাঢ়তা অনুভব করতে পারে। সেহেতু যে কোন সাহিত্য বা নাটক রচনার প্রাক্কালে একজন লেখককে মনে রাখতে হয়- শিল্প কখনও শিল্পীর চোখ এড়াতে পারে না।



Drawing By: Aaron Saha (9 years old)





A long journey that left three certain Sirs' "khoob khoobharto"

-Riana Debnath (12 years old)

It was our final day in Bangladesh before flying to Perth and there were a lot of things planned. I found it quite funny because I had woken up in Bangladesh, but I knew that I would wake up in Perth Australia the next day.

After packing up all our things, we rented a private microbus to Dhaka. Saying our goodbyes were the hardest. My grandfather's building is my favourite place in the whole entire world, but luckily, we weren't the only ones leaving. My grandmother and the youngest aunty were coming with us too. It was planned that we would drop them off once we reach the city (aunty was going to her dental college) and then Dad, Mum and I would head to the airport.

We got into the micro-bus at around 6 am and was expecting to reach Dhaka by 12 pm. Six hours of travel is a lot to me, but there were so many people to talk to so I kept myself busy. We didn't have time to eat breakfast before we started the journey, so we had "rooti and aloo bhaji" in the microbus. It was pretty delicious. After about 2 hours, we bought some peanuts and chips to eat. Potato crackers are my favourite chips in the entire world. They are so good.

There was so much congestion on the road - it was unbelievable. We had to stop every now and then for different amount of times, and finally arrived at Dhaka at 5 pm. We have travelled for 11 hours! Luckily our flight was after midnight. Once we had dropped off my grandmother and aunty, we headed straight into the centre of Dhaka.

Our stomachs were rumbling at this point, so we found this restaurant to eat at. We ordered rice and butter chicken to start off with. The waiter gave us one full plate of rice to make 3 serves for three of us. We immediately realised that these three people serve of rice would not fill up our 9-fold hungry stomachs after the whole day journey. Dad then ordered another full plate of rice, thinking that it would now be enough. Mum, in the meantime, ordered 3 serves of "laal shaak" - her all-time favourite vegetable. After the second whole plate of rice had disappeared in the blink of an

eye, Dad ordered a third plate along with some more chicken and "laal shaak" (credit to Mum for the tasty "shaak"). While enjoying our giant feast, we overheard the waiter whispering, "Sir re ra khoob khoobharto." In our minds we laughed heavily but were too interested in finishing our food before heading to the airport.

We still had about 5 to 6 hours before our plane would start boarding so we roamed around different areas of the airport and got some rest. About 4 hours later, Dad and I both got hungry again, so he got a vegetable roll and got me a chicken roll. Interestingly, there was no chicken in my chicken roll! I don't know how they named it a chicken roll!

Finally, after ages of waiting, we got onto the plane and after about 10 more hours we landed in Australia. That was the longest journey I had ever done in my life. In Bangladesh it was smoking hot, but Perth was like freezing! I loved every moment of our trip to Bangladesh, but still can't forget the iconic phrase "Sir re ra khoob khoobharto".

JOKES!

-Shayan Dash

No.1 JOKE

Imagine that you are in a house where you can't get out, it's bare, everything is made out of steel, how do you get out?

No.1 Answer: Stop imagining!

No.2 JOKE

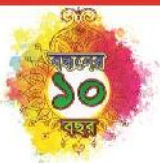
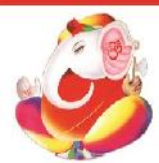
There is a 1 storey house, everything is red, the walls, the rooms, the kitchen, the bathroom the furniture as well! What are the stairs colour?

No.2 Answer: There are no stairs since it is a one storey house!

No.3 JOKE

What did the buffalo say when his son left for college?

Bison.





No.4 JOKE

Why shouldn't
you write with a
broken pencil?

Because it's
pointless.

No.5 JOKE

At the bank today a person told another person to check
his balance - he pushed him over!

No.6 JOKE

Two blondes were
driving to Disneyland.
The sign said:
Disneyland Left..
So they started crying
and headed home.

No.7 JOKE

Why do we
tell actors to
"break a leg?"

Because every play
has a cast.

I hope you liked my jokes!



Drawing By: Dipannita Saha (Troyee) [9 years old]

অতি-পাণ্ডিত্যের দৌরাণ্ড

-আজিজ ইসলাম

"নয়ন-ভরা জল গো তোমার আঁচল-ভরা ফুল।
ফুল নেবো না অশ্রু নেবো, ভেবে হই আকুল।।"

কবির আকুলতা আমাদের মস্তিষ্ক-পীড়ার কারণ নয় – কবিদের আর কী
কাজ? – অকাজের কাজ যত, আলস্যের সহস্র সঞ্চয়। আমাদের উদ্বেগ এর
পরবর্তী পংক্তিদ্বয় নিয়েঃ

"ফুল যদি নিই তোমার হাতে
জল রবে গো নয়ন-পাতে।"

কেন???

বহুদিন পর গানটির এই নতুন ভাষ্য শুনে কানে খটকা লাগলো। আবাল্যকাল
শুনে এসেছিঃ

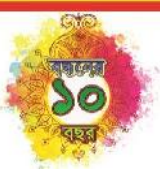
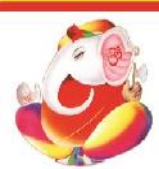
"ফুল যদি নিই তোমার হাতে
জল রবে না নয়ন-পাতে।"

এবং সেটাই স্বাভাবিক মনে হয়েছে – বাল্য-বুদ্ধিতেও বুঝতে কোন অসুবিধা
হয়নি। ফুল আনন্দের প্রতীক, তার সঙ্গে অশ্রুর সম্পর্ক বৈপরীত্যের, অর্থাৎ
তাদের সহাবস্থান সাধারণত অস্বাভাবিক, ব্যতিক্রম প্রাসঙ্গিক মাত্র।

দৃশ্যটির বাস্তবতা কল্পনা করুন। যে আঁচল ভরে ফুল তুলেছে, তার নয়ন-
ভরা জল কোন দুঃখে? আঁচল ভরে ফুল তোলার সুখে আনন্দাশ্রু? হাসবেন
না। গানটির নতুন ভাষ্য এমনই হাস্যকর। বালিকা তার ভালবাসার পাত্রকে
ফুলের নৈবেদ্য দিবে বলে আঁচল ভরে ফুল তুলেছে, কিন্তু তার ভালবাসার
পাত্র তার নৈবেদ্য নিবে কি না সে দ্বিধায় তার চক্ষু জলে ছলছল। যদি
ভালবাসার পাত্র তার নৈবেদ্য গ্রহণ করে, তাহলে কোন কারণে তার চোখে
জল থাকবে?

শব্দে শব্দ মিলিয়ে পদ্য লিখলেই তা কবিতা বা গান হয় না। ভাষা যখন
শব্দের বাস্তবিক পার্থিব অর্থ অতিক্রম করে অতীন্দ্রিয় লোকান্তরে উত্তীর্ণ হয়
তখনই তা হয় কবিতা বা গান – শিল্প। পার্থিব দুই বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে
একটিকে গ্রহণ করলে অন্যটি পড়ে থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। এর নাম
বাস্তবতা। এর মধ্যে কাব্যতা নেই। ফুল নিলে অশ্রু থেকে যাবে, অশ্রু নিলে
ফুল পড়ে থাকবে। এই সাদামাটা বর্ণনায় কোন অতীন্দ্রিয় ভাব বা তুরীয়
ভাবনার ছোঁয়া নেই। এ হলো দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষা, প্রাত্যহিক
প্রয়োজনের জন্য নিরাবেগ নীরস বিবর্ণ সংবাদ মাত্র। কবিতা অবাস্তব নয়,
উচ্চ মার্গের বাস্তব – পরাবাস্তব। আমি বলতে চাই, এই বর্তমান ভাষ্য কবির
রচনা নয়, পরবর্তীকালে কোন পাণ্ডিত্যের "সংশোধন"। কাজী নজরুল
ইসলাম কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় করেনি তো, ইত্যাদি। খাঁটি সোনা ছাড়িয়া
যে নেয় নকল সোনা, সে-জন সোনা চেনে না। আমাদের সন্দেহভাজন
অতি-পণ্ডিত সোনা চেনে নি। রাঙা দিল কী সোনা দিল ও তুই পরখ করে
দেখলি না, গুরু তোরে কী ধন দিল বুঝলি না মনা। রাঙের চাকচিক্যে বিভ্রান্ত
মন প্রাপ্ত ধনের পরোক্ষ মর্ম অনুধাবনের ধৈর্য বা বিচার করার অবকাশ পায়
নি।

তাহলে কবি কী বলতে চায়?





কবি রূপমুগ্ধ, রূপ-বিলাসী, সৌন্দর্য-কাতর। লোভী কবি, সে গাছেরও খাবে, তলারও কুড়াবে। সে আঁচল-ভরা ফুলও নেবে, জল ছলছল চোখের সৌন্দর্যও উপভোগ করবে, কিন্তু ফুল নিয়ে অশ্রুর মুক্তা হারানোর আশঙ্কায় সে উতলা। অশ্রু নিলে ফুটবে না আর প্রেমের মুকুল, তাই বা কী করে গ্রাহ্য হবে? কবির লোভী মন ও নিষ্ঠুর স্বার্থপরতার এই দ্বন্দ্ব পরবর্তী স্তবকেও সুস্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছেঃ

“মালা যখন গাঁথ তখন পাবার সাধ যে জাগে
মোর বিরহে কাঁদ যখন আরো ভাল লাগে।”

অশ্রুর রূপে কবি বিমোহিত, তাই অন্যত্রও, টলমল জল-মোতির মালা ঝালর-পলকের মত কবিকে মুগ্ধ করেছে। কবির লোভী স্বভাবে তার প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাব সর্বগ্রাসী। কবির দেশের মত এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি যে দেশের কুঁচবরণ কন্যা হাসলে সোনা ঝরে আর কাঁদলে ঝরে মুক্তা

কবিদের রূপ-পিপাসাই তাদের অনুপ্রেরণার উৎস, সেই পিপাসার শেষ নেই, আর নিরন্তর তার নিরসনের জন্য বিচরণে কবিদের অস্থিরতাও চিরন্তন জনম অবধি হুম রূপ নেহারণু নয়ন না তিরপতি পেল দেখে দেখে সাধ মেটে না, তাই উৎকর্ষা ব্যগ্রতা আর চাঞ্চল্যেরও শেষ নেই তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয় সে কি মোর অপরাধ? চক্ষু আমার তৃষ্ণা, তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে

Beauty is in the eye of the beholder

আমাদের মত নশ্বর জীবদের পক্ষে তার সম্যক উপলব্ধি সহজ নয়, তাই তো আমরা সর্বদা রাগ ও সোনার পার্থক্য নির্ণয়ে ব্যর্থ হই। বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে / দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা, / দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু / দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া / ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া / একটি ধানের শিষের উপর / একটি শিশিরবিন্দু।।

অশ্রুর আবেদন সৌন্দর্যেরও উর্ধ্বে। অনিন্দ্য এক সমাধি স্মৃতিসৌধকে রবীন্দ্রনাথ দেখলেন যেন প্রেমিকের অর্ঘ্য কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল এক বিন্দু নয়নের জল। এক মর্ত্য-বাসী লক্ষশত বর্ষ স্বর্গ-আতিথ্য হতে বিদায়ের ক্ষণে হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছেঃ আজি শেষ বিচ্ছেদের ক্ষণে / লেশমাত্র অশ্রুলেখ্য স্বর্গের নয়নে / দেখে যাব এই আশা ছিল। স্বর্গে তব বহুক অমৃত / মর্ত্যে থাক সুখে-দুঃখে-অনন্ত-মিশ্রিত / প্রেমধারা অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি / ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি।।

অশ্রু প্রেমের অমোঘ প্রতীক। ক,ফোঁটা চোখের জল ফেলেছ যে ভালবাসবে?

আমাদের সন্দেহ, ১৯৫২ সালে (বঙ্গাব্দ ১৩৫৯) গানটি যখন “বুলবুল দ্বিতীয় খণ্ডে” সঙ্কলিত হয়, তখন কোন সঙ্কলক বা সঙ্কলকবৃন্দ সমবেতভাবে এই “সংশোধন” করেছে – কবির বাকশক্তি হারানোর দশ বছর পর। প্রকাশিকা প্রমীলা নজরুল ইসলাম, আইনানুগ স্বত্বাধিকারিণী, কিন্তু প্রকৃত সঙ্কলকগণ সম্ভবত কবির বন্ধুবর্গ, বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পরিষদে জড়িত বা নয়। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত নজরুল রচনাবলীর গ্রন্থ-পরিচয়ে এ-গানটি সম্বন্ধে কোন মন্তব্য নেই, অর্থাৎ গানটি পূর্বে কোন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে কি না তা অজানা।

বিদগ্ধ পাঠক-পাঠিকাগণ এ-রচনাটিকেও অতি-পাণ্ডিত্যের দৌরাণ্য বলতে পারেন, কিন্তু বিকল্পে সত্য উদ্ঘাটনের জন্য কিঞ্চিৎ গবেষণার কষ্ট স্বীকার

করা অধিকতর ফলপ্রসূ হতে পারে। মানব স্মৃতিভ্রংশতা স্বাভাবিক। নজরুল-সঙ্গীত শিল্পীদের জন্য এ-প্রকার অনুসন্ধান গুরুত্বপূর্ণ।

মূল রচনার কোন পাণ্ডুলিপি পাওয়ার সম্ভাবনা ন্যূন। কিন্তু কোলকাতা ও ঢাকার বেতারকেন্দ্রে ও নজরুল একাডেমীতে, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী ও অনুরূপ সঙ্গীতের অনুশীলন ও শিক্ষাকেন্দ্রে, বিভিন্ন সাহিত্য-সঙ্গীত গবেষণাগার, সংগ্রহাগার ও মহাফেজখানায়, নজরুল-ভক্ত সঙ্গীত-ভক্ত সুধী নাগরিকদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য নজরুল-সঙ্গীত শিল্পীদের গাওয়া আলোচ্য গানটির ১৯৫২-পূর্ব কালের এবং পঞ্চাশের দশকেরও “সংশোধন” অজ্ঞাত থাকা সময়ের ভাইনিল রেকর্ড বা স্টুডিও রেকর্ড এবং তা-থেকে কপি করা পরবর্তী ক্যাসেট টেপ রেকর্ড খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। “জল রবে না নয়ন-পাতে” ভাষ্যের কোন রেকর্ডের অস্তিত্ব এ-ভাষ্যই কবির মূল রচনা প্রমাণ করবে।

মিতি

-কমলেশ রায়

মিতি, মশারি ঠিকমতো গুজেছো?

হ্যাঁ, মা।

তাহলে এবার আলো নেভাও।

এক মিনিট মা। গল্পটার আর একটুখানি বাকি আছে।

এখন গল্পের বই রাখো।

প্লিজ মা, আর মাত্র তিন চারটে লাইন...।

বলেছি তো। এবার বই রাখো।

মা প্লি...জ...।

এক কথা বারবার বলতে আমার ভালো লাগে না। তোমাকে রাখতে বলেছি রাখো।

আচ্ছা, যাও রাখলাম। এবার খুশি তো?

এখন দয়া করে লাইটটা নেভাও।

তুমি নেভাও। বেড সুইচ তো তোমার হাতের কাছে।

না, তুমি নেভাবে।

কেন তুমি নেভালে কী হয়।

কিছুই হয় না। তবে তুমি দেরি করেছেো। তাই লাইটটা তোমাকেই নেভাতে হবে।

তোমার গায়ের উপর দিয়ে গিয়ে নেভাবো মা?

বাজে কথা বলো না। যেটা বলছি সেটা করো।

ঠিক আছে মা। নেভাচ্ছি।... এই নেভালাম। খুশি তো?

হ্যাঁ খুশি। এখন দয়া করে ঘুমাও।

মা, একটা কথা বলি।

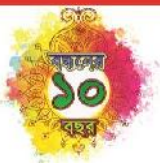
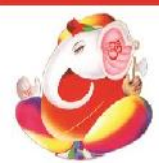
আর কোন কথা নয়। দুই মিনিটের মধ্যে ঘুমাতে। যা বলার সকালে বলবে।

প্লিজ মা, একটা কথা।

কি কথা বলো?

দুই মিনিটের মধ্যে ঘুমালে আমাকে কী কিনে দেবে?

তুমি যদি আর একটা কথা বলো তাহলে ভবিষ্যতে তোমাকে আমি কিছুই কিনে দেবো না।





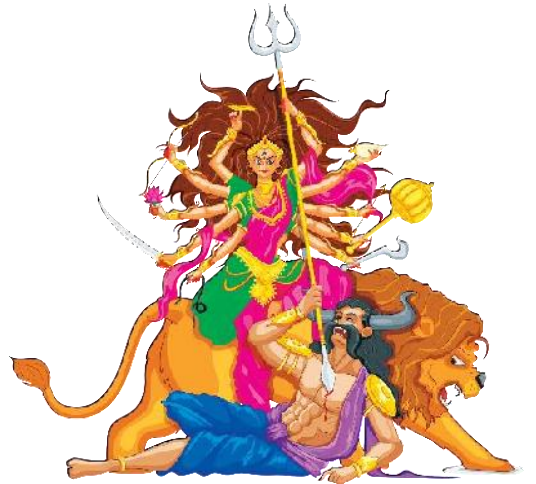
মা প্লিজ, প্লিজ...জ...। বলো না কি কিনে দেবে?
 কিচ্ছু কিনে দেবো না। ঘুমাতে বলেছি ঘুমাও।
 সব ঠিক হলে "Elsa" এর একটা জামা কিনে দিও।
 বললাম তো কিচ্ছু কিনে দেবো না। তোমার কোনো আবদার আর আমি রাখব না।
 আচ্ছা, দুই মিনিটের মধ্যে ঘুমাচ্ছি। শুধু "Elsa" এর জামা কিনে দিও।
 আহ, এত কথা বলো না। কাল সকালে তাড়াতাড়ি উঠতে হবে। তুমি কাল নয়টার আগে উঠবে।
 আচ্ছা উঠবো। তবে একটা অনুরোধ...।
 এখন আর কোনো অনুরোধ নয়।
 এখন না মা। কাল সকালের...।
 সকালেরটা সকালে দেখা যাবে।
 কাল আমাকে মসলা চা দিও না প্লিজ। এত লেবু দাও। অনেক টক, তারপর কষ কষ...। বিশ্রী একটা জিনিস।
 ওই বিশ্রী জিনিসটাই তোমাকে খেতে হবে। অবশ্যই খেতে হবে। করোনার সময় এতো স্বাদ দেখলে চলে না। মতি প্লিজ ঘুমাও। নইলে ওই বিশ্রী জিনিসটা কাল তোমাকে ডাবল খেতে হবে।
 না মা, এটা ঠিক না।
 তুমি এখন কথা বাড়াচ্ছো, এটাও কিন্তু ঠিক হচ্ছে না।
 আচ্ছা আর কথা বলবো না। তুমি আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও।
 আমি পারবো না। একদম আমার কাছে আসবে না। দূরে থাকো। তোমাকে দুই মিনিটের মধ্যে ঘুমাতে বলেছিলাম, সেটা কিন্তু পার হয়ে গেছে।
 দাও না মা। এমন কেন করো।
 বললাম তো পারব না। তুমি ঘুমাও। আর একটা কথাও বলবে না।
 উফ! বাবা যে কবে এ ঘরে ঘুমাবে।
 কেবল ১৪ দিন পার হয়েছে। আরও কিছুদিন যাক।
 কিন্তু বাবাকে ছাড়া তো আমার ঘুম আসতে চায় না।
 এই তো আর কয়েকটা দিন মতি। তারপরই তুমি বাবার সঙ্গে ঘুমাতে পারবে।
 ইস! কতদিন বাবাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাই না।
 থাক এটা আবার তোমার বাবাকে বলো না। তাহলে তার মন খারাপ হবে।
 ভিডিও কলে বাবাকে আমি মোটেও মন খারাপ করা কথা বলি না মা। ভালো ভালো কথা বলি। মজার মজার কথা বলি।
 এই তো আমাদের মতি সব বোঝে। আমাদের মতি হলো লক্ষ্মী মেয়ে।
 মাঝে একদিন বাবার কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছিল। বলল ভীষণ গলা ব্যথা।
 তখন আমি অভয় দিয়েছি। বলেছি, বাবা তুমি কিচ্ছু চিন্তা করো না। আমি তোমার জন্য প্রতিদিন প্রার্থনা করছি। তোমার কিচ্ছু হবে না।
 শুনে তোমার বাবা কী বলল?
 বাবা বলল, আমার মতি সোনামা বলেছে কিচ্ছু হবে না, তো কিচ্ছু হবে না।
 করোনা এবার পড়িমড়ি করে পালাবে। বলে হো- হো করে হাসার চেষ্টা করলো। কিন্তু হাসিটা ঠিক মত হলো না। আমি অবশ্য এমন ভাব করেছি যে হাসিটা ঠিকমতো হয়েছে। বাবাকে একদম বুঝতে দেইনি। ভালো করেছি না মা?
 খুব ভালো করেছে। তোমার আসলেই অনেক বুদ্ধি।
 একটা কথা বলি মা।

বলো।
 যে দিন বাবার কাছে যেতে পারব, আমি সারাদিন বাবার সঙ্গে সঙ্গে থাকব।
 রাতে বাবাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাবো। সেদিন খুব মজা হবে, তাই না মা?
 মতি, তুমি কী কাঁদছো?
 না মা, কাঁদবো কেন? আমি তো সব বুঝি। শুধু বাবার জন্য কষ্ট হচ্ছে।
 সব ঠিক হয়ে যাবে মতি। এসো তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাও।
 পাশের ঘরে একা থাকতে বাবারও নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে।
 অবশ্যই হচ্ছে। মন খারাপ করো না মতি সোনা। সব ঠিক হয়ে যাবে।
 তাই যেন হয় মা। বাবা যেন তাড়াতাড়ি আমার কাছে আসতে পারে।
 আসবে মতি সোনা। আসবে...। তুমি আমাকে জড়িয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাও।

মা দুর্গা

-ডলি সাহা

দেবী দুর্গা দোলায় চড়ে ধরাধামে আসছে
 ত্রিভুবনে ঢাকের তালি মধুর সুর বাজছে।
 আশ্বিন মাসে বাপের বাড়ি আসেন ভগবতী
 সংগে করে কার্তিক গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী।
 দশভূজা জগত মাতা দুর্গাতি নাশিনী
 দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন মঙ্গল কারিনী।
 কৈলাস ছেড়ে আসছে মাগো কতনা সাধ করে
 মর্ত্যধামে পূজা পেয়ে যাবে শিবের ঘরে।
 শিবের ঘরনী তুমি মা জগত জননী
 ত্রিলোক পালিনী তুমি অসুর মর্দিনী।
 শিশির ভেজা শিউলী ফুলে শরতের কাঁশবনে
 তোমায় মাগো স্মরণ করি জীবনে মরণে।
 দেবী দুর্গা মহামায়া কৈলাশ ভবানী
 সুখে ছন্দে রেখ মাগো সুন্দর ধরণী।





প্রযুক্তি, সংযুক্তি, অতঃপর...

-দীপ জন মিত্র

২০৭০ সালের এই গল্পটি একটি পরিবারের চারজন সদস্যের, যারা তিনটি ভিন্নদেশে থাকেন। অস্ট্রেলিয়ার পার্থে বৃদ্ধা মিসেস প্রীতিলতা, তাঁর পুত্র সাত্যকী আর পুত্রবধূ অর্কজা আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায়, একমাত্র নাতি স্বপ্ন কানাডার টরেন্টোতে। সাত্যকী পদার্থবিদ- এখন তাকে স্যাট নামে সবাই ডাকে, অর্কজা বায়োমেডিকেল ইন্সট্রুমেন্ট বিশেষজ্ঞ। স্বপ্ন ইয়ার সেভেনে পড়ছে।

এক দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত প্রীতিলতা- চলাফেরার শক্তি প্রায় নেই, অর্কজা তাঁর সার্বক্ষণিক সেবার জন্য আধুনিকতম প্রযুক্তির রোবট নার্স বা নার্সবট ইন্সটল করে দেয়। প্রীতিলতার হাটের অবস্থাও ভালো নয়, তাই হার্টবট নামের আরেকটি যন্ত্র বসানো আছে। নার্সবট আর হার্টবটের মাধ্যমে মায়ের শরীরের সর্বশেষ অবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্যাটের কাছে পৌঁছে যায়।

১ম পর্ব

ক্যালিফোর্নিয়ায় কোন এক উইক এন্ডে সকালবেলায় আইফোন-৭৫.৫ প্রো-এর যান্ত্রিক মেসেজের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায় স্যাটের। পার্থ থেকে মায়ের অনেকগুলো কল এসেছে দেখেই চমকে ওঠে সে। দেবী না করে সাথে সাথে মাকে কল করে স্যাট। বারকয়েক রিং হওয়ার পর প্রীতিলতার দুর্বল কণ্ঠ শোনা যায়।

"কেমন আছিস খোকা, বৌমা ভাল আছে? ব্রেকফাস্ট করেছিস? আমার দাদুভাইটা কেমন আছে? কতদিন ওদের সাথে কথা হয়না!", একনাগাড়ে বলে যান প্রীতিলতা।

"মা, আমরা সবাই ভাল আছি। তুমি কেমন আছো? সকালে খেয়েছো?"

"তোদের নার্সবট তো খাইয়ে দিলো একটু আগে। কোন স্বাদ নেই খাবারে-লবণ নেই, বাল নেই!"

"মা, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী তোমার জন্য দরকারী সব পুষ্টিগুণ নার্সবটের সফটওয়্যারে ইনপুট দেওয়া আছে। তুমি অনেকবার কল দিয়েছো, তোমার শরীর ভাল, মা?"

"এমনি ভালোই আছি, শুধু কোমরের ব্যাথাটা একটু বেড়েছে।"

"নার্সবট-এর থেকে সেটা আমি জানতে পেরেছি মা। তুমি এক কাজ কর, তোমার ডানদিকে লাল রঙের যে প্রোবটা আছে, ওটা তোমার ব্যথার জায়গায় টাচ কর, অটোম্যাটিক পেইন রিলিফিং থেরাপি হবে।"

"সেটা তো দিয়েছিলাম", মা বলেন, "থেরাপিতে তো কাজ হয় না!"

"একটু ওয়েট কর মা"- এই কথা বলে স্যাট নার্সবটের রিসেন্ট পেশেন্ট হিস্টরি চেক করে, আর চেক করেই আবার চমকে ওঠে, "মা, তিন দিন আগে পেইন রিলিফার-এর ব্যাটারী ডাউন হয়ে গিয়েছে, মেসেজটা আমি খেয়ালই করিনি! আমি আজই তোমার বউমাকে ভার্সুয়াল ব্যাটারী রিপ্লেসমেন্ট করে দিতে বলবো।"

প্রীতিলতা কিছুক্ষণ নীরব থাকেন, তারপরে ক্ষীণ কণ্ঠে বলেন, "খোকা, তুই কি ওখানেও গোলাপের চারা লাগিয়েছিস? তোর মনে আছে, মদনডাঙ্গা স্যাটেলাইট ইউনিভার্সিটিতে তখন তুই পড়তিস, একবার ছুটিতে বাড়ি এসে গোলাপ গাছগুলো মরে গেছে দেখে তোর সে কি মন খারাপ! সারা ছুটি আর বাড়ি থেকেই বের হলি না!"

"মা, এখন আমার বাগান করার সময় কই! অর্কজাও ভীষণ ব্যস্ত!" স্যাট যেন প্রীতিলতাকে অজুহাত দেয়।

প্রীতিলতা বলে চলেন, যেন ছেলের কথা শুনতেই পাননি, "তোর বাবা আমাকে রেখে কি নিশ্চিন্তে ওপাড়ে চলে গেলেন! আমি একা হয়ে যাবো বলে তোরা আমাকে পার্থে নিয়ে এলি। তোদের পিএইচডি শেষ হয়ে গেল, চাকরি করতে চলে গেলি সেই টরেন্টো! তারপর ক্যালিফোর্নিয়া। আমি অসুস্থ হয়ে তোদের ঘাড়ে বোঝার মত থেকে গোলাম পার্থেই!" প্রীতিলতার কণ্ঠ যেন কঁপে ওঠে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, "তোদের ভয় ছিল আমি একা হয়ে যাবো, আমি তো একাই হয়ে গোলাম, খোকা! আমিও একা, আমার দাদুভাইটাও একা!"

পেশেন্ট টকিং ইন্ডিকেটর স্যাটের কাছে সিগন্যাল পাঠায়, সেটা দেখে স্যাট বলে, "মা, তোমার আর বেশি কথা বলা ঠিক হবেনা, এবার একটু ঘুমানোর চেষ্টা কর।"

প্রীতিলতার কথায় অসহায়ত্ব, "তোদের নার্সবট যে ঘুম এনে দিতে পারে না!" তারপরে বলেন, "তোদের ওখানে তো এখন সকাল, তোরা ব্রেকফাস্ট কর। কতদিন দাদুভাইকে দেখিনা, ওকে একটু দেখাবি?" শেষের কথাগুলো যেন আবদারের মত ছেলেকে বলেন প্রীতিলতা।

"ঠিক আছে মা, নেক্সট উইকে আমি কনফারেন্স কল করবো, এখন একটু বিশ্রাম নাও" বলে স্যাট কল বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

২য় পর্ব

স্যাট দুপুরের দিকে ছেলে স্বপ্নকে ভিডিও কল দেয়। আগের দিন স্বপ্নের পড়াশোনার প্রোগ্রেস রিপোর্ট তার কাছে এসেছে- ফিউচার ভার্সুয়াল টেকনোলজি পরীক্ষায় স্বপ্ন খুব খারাপ স্কোর করেছে।

"হ্যালো বাবা, কেমন আছো? মা কেমন আছেন?"- বাবার কল পেয়ে স্বপ্ন খুব খুশি!

"আমরা ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? তোমার স্টাডি প্রোগ্রেস খুব খারাপ- আমার কাছে রিপোর্ট এসেছে! কি সমস্যা তোমার বলতো?"- বকুনির স্বরে স্যাট বলে।

"বাবা, আমার এই বিষয়গুলো ভালো লাগে না!"

"তো কি ভালো লাগে তোমার?"

"ওয়ার্ল্ড হিস্টোরি, লিটারেচার- এগুলো আমি বেশি এঞ্জয় করি।"

"তুমি স্কুলের জুনিয়র রাগবি খেলাতে খারাপ করেছো, তোমার ওবেসিটি ইনডেক্স সন্তোষজনক না!", স্যাটের কাছে স্বপ্নের আউটডোর গেমস পারফরম্যান্স, গ্রোথ ইনফরমেশন এসব তথ্য অ্যান্স-এর মাধ্যমে আসে।

"বাবা, আমার দাবা খেলতে খুব ইচ্ছে করে।", স্বপ্ন তার ভালো লাগার কথা বাবাকে জানায়।

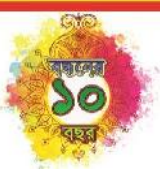
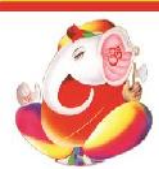
"আর কি কি ইচ্ছে করে তোমার?", স্যাটের কথায় ব্যাঙ্গের সুর।

"তোমাদেরকে, ঠাম্মিকে দেখতে ইচ্ছে করে, ভিডিও কলে না, সামনাসামনি! নেক্সট স্টাডি ব্রেক-এ তুমি আর মা আসবে?", কাঁদকাঁদ কণ্ঠ স্বপ্নর।

"স্বপ্ন, বি ম্যাচিওরড মাই বয়!", স্যাট বলে, "আগামী ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে ওয়ার্ল্ড বায়োসেন্সর টেকনোলজিকাল ফোরাম-এর বিশাল কনফারেন্স আছে, তোমার মা এখন ওটার প্রিপারেশন নিয়ে খুব ব্যস্ত।"

"তাহলে ঠাম্মিকে একটু দেখাবে?", স্বপ্ন যেন কঁদেই ফেলবে।

"আচ্ছা ঠিক আছে বাবা, নেক্সট সানডেতে আমি তোমাদের কথা বলিয়ে দেবো। একটু মনোযোগ দিয়ে পড় বাবা!"





৩য় পর্ব

পরের রবিবার তিন দেশ থেকে তিন প্রজন্ম ভিডিও কনফারেন্সে যোগ দেয়। অর্কজাও কনফারেন্স কলে ছিল- কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত বায়োটেকনোলজিস্টের সাথে। তাই এই পারিবারিক কলে সে থাকতে পারেনা। ঠাকুমাকে দেখেই স্বপ্ন চিৎকার করে বলে, "ঠাম্মি ই ই ই! তুমি কেমন আছো?"

প্রীতিলতার উত্তরের আগেই স্যাট ছেলেকে ধমক দিয়ে বলে, "স্বপ্ন, তোমার কথার ভলিউম ডেঞ্জার লেভেলে পৌঁছে গেছে, আস্তে কথা বল।"

"আহা, করুক না একটু চিৎকার। কতদিন পর দাদুভাইটার আদুরে গলাটা শুনতে পেলাম!", প্রীতিলতা যথারীতি নাতির পক্ষ নেন, তারপর বলেন, "কিন্তু আমি তো তোদের দেখতে পারছি না, তোরা কি আমাকে দেখতে পারছিস?"

স্যাট মাকে বলে, "ওফ, মা! তুমি শুধু ভুলে যাও! তোমার সামনে ৬৫ মেগাপীক্সেল এর ক্যামেরা, দেয়ালে আলট্রা ভিশন ইমেজ প্রজেকশনে ছবি হবে, তাই আমাদের দেখতে হলে তোমাকে আলট্রা ভিউ গগলসটা পড়তে হবে, যেটা তোমার বামদিকে রাখা আছে।"

প্রীতিলতা আসলেই গগলস পড়তে ভুলে যান, "ও হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই প্রতিবারই বলিস, আমারই মনে থাকে না!", গগলস পড়েই তিনি বলেন, "এইতো আমি সব দেখতে পাচ্ছি! দাদুভাই তুমি কেমন আছো?"

"আমি ভালো আছি ঠাম্মি। আমরা গত ডিসেম্বরে স্নো দেখেছি, ঠাম্মি!", স্বপ্ন ঠাকুমার কাছে এই গল্পটা করার সুযোগ পায়নি এতদিন।

"তাই? অনেক মজা করেছে! তোমার ঠাণ্ডা লাগেনি, দাদুভাই?"

"ঠাম্মি, আমরা তো ডাইরেক্ট বরফের কাছে যাইনি। বাবা, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আলট্রা ভিশনে মাউন্ট আল্পস সেট করে দিয়েছিল, আর আমি টরেন্টো থেকে জয়েন করি!", স্বপ্ন ঠাকুমাকে বুঝিয়ে দেয়।

"ও আচ্ছা, তুমি খেয়েছো দাদুভাই?"

স্বপ্ন যেন কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে যায়। তারপর কাঁদ কাঁদ স্বরে বলে, "ঠাম্মি, আমি তোমার কাছে যেতে চাই, তোমার হাত ধরে কিংস পার্কে ফুল দেখবো, সোয়ান নদীর ধারে ঘুরে বেড়াবো। তুমি আমাকে এলিজাবেথ কী-তে নিয়ে যাবে, ছোটবেলায় যেমন নিয়ে যেতে, আমি জলের মধ্যে লাফালাফি করতাম, আর তুমি আমার ছবি তুলে দিতে! আমার একা একা এখানে ভালো লাগে না, ঠাম্মি!"

"শোন, বুড়ো দাদুর কথা! তোমার এখন পড়াশোনা আছে না, দাদুভাই?", প্রীতিলতা নাটিকে বলেন বটে, কিন্তু আবেগ লুকাতে পারেন না। তারপর ছেলেকে বলেন, "হ্যারে খোকা, বউমা আর দাদুকে আগামী সামারে একবার নিয়ে আসবি পার্থে?"

"এই ডিসেম্বরে অর্কজার খুব ব্যস্ততা, মা। এখন পারবো না।", স্যাট বলে।

"ও আচ্ছা।", এবার প্রীতিলতার কান্না স্পষ্ট শোনা যায়। ঠাকুমার কান্না যেন স্বপ্নকেও আবিষ্ট করে ফেলে।

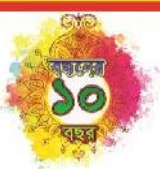
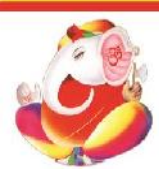
"মা, তোমার আর কান্না করা ঠিক হবে না। তোমার কান্নাতে সল্ট আর মিনারেলস অপটিমাম লেভেল টাচ করেছে। আরো বেশী কাঁদলে তোমার বডি মিনারেলস এর ব্যালেন্স ক্ষতিগ্রস্ত হবে।", পেশেন্ট কারেন্ট ইনডিকেটর স্যাটের কাছে প্রীতিলতার সার্বক্ষণিক তথ্য পাঠায়।

প্রীতিলতা কোনরকমে কান্না চেপে আস্তে আস্তে বলেন, "ঠিক আছে খোকা, এবার না পারলে সময় সুযোগ করে একবার আসিস। কবে আবার দেখবি, তোদের হাটবট আমার হাটবিটের নো-রেস্পন্স সিগন্যাল পাঠাচ্ছে তোরা কাছে! আবার ব্যাটারী ডাউন হয়ে গেলে তো সে খবরও তোদের কাছে পৌঁছাবে না!"

অপূর্ণতা

-সুমিতা বিশ্বাস সুমি

নিধি আজ খুব সুন্দর করে সেজেছে, চোখে কাজল, কপালে ছোট টিপ আর হালকা লিপস্টিক আর সাথে ওর প্রিয় জামদানি শাড়ী। আয়নায় ও নিজেই যতবার দেখছে বার বার যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ করে মুঠোফোনের আওয়াজে নিধি সম্বিত ফিরে পেল। সকাল থেকে এত কিছু যার জন্যে তার নম্বরটা দেখে খুশিতে ডগমগ হয়ে ফোনটা রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে, শুনছো আজকে অফিসে এত কাজ যে রাত ১১টার আগে হয়তো বাসায় ফিরতে পারব না। এই বলে শান্ত ফোনটা রেখে দিল। নিধির এখন এই কথাগুলো শুনতে খারাপ লাগে না। অভ্যস্ত হয় গেছে ও। কারণ এই দিনটা মানে ওদের বিবাহ বাষিকিটা শান্তের কখনোই মনে থাকে না। প্রতিবার নিধি অফিস থেকে ফেরার পথে শান্তের জন্য গিফট নিয়ে আসে। রাতে যখন নিধি শান্তকে গিফটটা দেয়, তখন শান্ত জিজ্ঞাস্য একটা কামড় দিয়ে বলে, এ যা!!! এবারও ভুলে গেলাম। সরি সুইটু এবারের মত মাফ করে দাও, পরেরবার অনেক বড় করে করব। নিধি মনে মনে হাসে কারণ সে জানে এই পরেরবার কখনোই আসবে না। প্রথম প্রথম সে শান্তের সাথে অনেক ঝগড়া করত, কিন্তু এখন সে সব মানিয়ে নিয়েছে। আজকের দিনটা নিধির অফিসের অফ-ডে'র সাথে মিলে যাওয়ায় সকাল থেকে ও শান্তের সব পছন্দের খাবার রান্না করেছে। যতই মুখে বলুক মানিয়ে নিয়েছে, একটু হলেও তো কষ্ট হয়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাতেই দেখে আজ পূর্ণিমা রাত। চাঁদটা যেন নিজের মহিমায় এই দিনের জন্য ওদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। এদিকে শান্ত ফোনটা রাখার পর মনে মনে হাসছে- এইবার সে এইদিনটার কথা ভুলে নাই। অনেক প্ল্যান করে রেখেছে এই দিনটাকে ঘিরে। প্রথমে একটি শাড়ির দোকানে গিয়ে নিধির পছন্দের জামদানি শাড়ি কিনবে। মেয়েটা জামদানি শাড়ি পরতে অনেক পছন্দ করে। তারপর নিধির পছন্দের কিটকেট চকলেট আর একগুচ্ছ গোলাপ ফুল। অনেক খুশি হয়ে যাবে মেয়েটা। হঠাৎ করে কলিংবেল বেজে উঠলো আর নিধি হকচকিয়ে ঘুম থেকে উঠলো। আসলে ওটা কলিংবেল না মোবাইলের এলার্ম বেজে উঠেছে। নিধির অফিসের সময় হয়ে গিয়েছে। নিধি বসে বসে ভাবল, এটা স্বপ্ন ছিলো, সত্যিই তো স্বপ্নই তো। কেননা বাস্তবে ওকে বোবার মত তো কেউ নাই, যে ভালোবাসবে। সব কিছু সহ্য করে হলেও কেউ বলবে না যে, পাশে আছি তো। কথা দিচ্ছি থাকবো সারাজীবন।





সামাজিক দূরত্ববাদ: বাংলার বাউল দর্শনের প্রায়োগিক মতবাদ

-ড. আমজাদ হোসেইন

টেকসই উন্নয়ন সহজ করার জন্য সামাজিক দূরত্বের বিধান প্রকৃতির একটি হিকমা বা প্রজ্ঞা এবং করোনার আগমন ও বিকিরণের সাথে সামাজিক দূরত্ব টেকসই উন্নয়নের সম্পর্ক চিহ্নিত করে। এ যেন 'শাপে বর'।

করোনা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার আধিক্য, প্রাচুর্যবাদ ও ভোগবিলাসমুখী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দ্বারা সীমাহীন প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করাকে রুখে দিয়ে প্রকৃতির সীমিত ধারণ, বাহন, নবায়ন ও প্রজনন ক্ষমতার টেকসই স্থিতিশীলতার পুনঃস্থাপন করছে।

টেকসই উন্নয়নে সহায়ক মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য 'নিখুঁত ব্যবস্থা' (perfect arrangement) প্রবর্তনের জন্য করোনা একটি অছিলা-একটি দৈব বা প্রাকৃতিক বিধান। এধরণের দৈব যা যুগে যুগে মহামারী, যুদ্ধবিগ্রহ, বিধ্বংসী সামাজিক কলহ, আবহাওয়া ও ভূমিকম্প জনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের আবির্ভাব ঘটায়।

বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী পাশবিক যৌনতা, সামাজিক বর্ণ বিদ্বেষ, অর্থনৈতিক অসাম্যতা, সামাজিক দাঙ্গা ও মানব হত্যা প্রতিরোধে এই করোনা জনিত মহামারীর আগমন ও বিকিরণ। এ যেন বিষ দিয়ে বিষ নাশ, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার একটি প্রাকৃতিক খেলা।

সামাজিক 'দূরত্ববাদ' (distance-ism) এর ভাবার্থ ও প্রয়োগ পদ্ধতি একাধিক। করোনা থেকে নিরাপদ থাকার জন্য সরকার ঘোষিত সামাজিক দূরত্ব পালন তার মধ্যে একটি। এ ক্ষেত্রে এক জনের শরীর থেকে আরেক জনের শরীর দেড়-দুই গজ দূরে রাখাকে বুঝায়। বর্তমানে ইহা একটি স্বীকৃত 'উপায়', 'পদ্ধতি', 'মতবাদ'। করোনা সংক্রান্ত সামাজিক দূরত্ব পালন করার বিধানটি সাম্প্রদায়িক, ধর্ম, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক সংক্রান্ত সামাজিক দূরত্ব পালনের বিধান থেকে আলাদা, অভূতপূর্ব। সাম্প্রদায়িকতা ও প্রকৃতিকে ধ্বংস করে অর্থ-সম্পদ উপার্জন থেকে দূরত্ব পালন সমাজের, রাষ্ট্রের জন্য শুভ। ইহাতে সবাই মিলে-মিশে সুখে শান্তিতে বসবাস করা যায় -সাম্যতা, সৌহার্দ্যতা বজায় থাকে। এই সর্বশুভ আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতটি বাংলায় অতীতে বিরাজমান ছিল। বর্তমানে চিত্রটি উল্টো - যা গবেষণার দাবি রাখে। কারন ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে 'জঙ্গিবাদ' ভাইরাস এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে 'দুর্নীতি পরায়ণ শোষণবাদ' ভাইরাস আমাদের টেকসই সুখী সোনার বাংলাকে পঙ্গু ও অকার্যকর করার পথে নিয়ে যাচ্ছে, থামানো যাচ্ছে না।

পক্ষান্তরে করোনা সংক্রান্ত চলমান সামাজিক দূরত্ব পালন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য মোটেও ফলপ্রসূ, মঙ্গলময় নয়। করোনার বহুমুখী, বহুরূপী আগমন ও বিকিরণ সমস্যা সমাধানের কোন কূলকিনারা কেহ পাচ্ছে না অথবা এর সমাধান অতীব সহজ বিধায় এটা উপেক্ষিত হচ্ছে।

স্বাস্থ্য বিষয়ক বুদ্ধিজীবীরা প্রথমে সরকারকে 'লকডাউন' পদ্ধতি গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। দীর্ঘমেয়াদি লকডাউনের ফলাফল অশুভ ও ক্ষতিকর। সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক ধ্বংস তার প্রমাণ।

রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক চিকিৎসকগণ মনে করেন করোনা ভাইরাস নাক, চোখ, মুখ এর মাধ্যমে সংক্রমিত হয়, তাই এই তিনটি শারীরিক অঙ্গকে সুরক্ষিত রাখতে পারলে করোনাকে রোখা যাবে। ইহা একটি সহজ পদ্ধতি। শিশু ছাড়া আর সবাই এটা মেনে চলতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এটা শক্ত ভাবে মানা হচ্ছে না।

করোনা প্রতিরোধে 'সামাজিক দূরত্ববাদের' কথা বলা হচ্ছে। ইহাও সঠিক ভাবে পালিত হচ্ছে না, অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছেও না। বিশেষ করে ঘন বসতিপূর্ণ দেশ গুলো যেখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে হাজারের অধিক লোক বাস করে, রাস্তা ঘাট হাট বাজার দোকানপাট লোকে লোকারণ্য থাকে সেখানে শারীরিক দূরত্ব বিধান মেনে চলা কঠিন। তাই এই পদ্ধতি কিঞ্চিৎ কার্যকরী হচ্ছে। প্রচলিত পদ্ধতিগুলির অপ্রতুল প্রয়োগ প্রমাণ করে যে বুদ্ধিজীবীদের উদ্ভাবনী চিন্তাতেও ধ্বংস নেমেছে, লকডাউন পদ্ধতি অকার্যকরী হয়েছে।

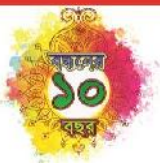
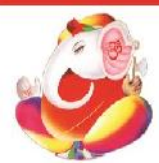
স্বাস্থ্য গবেষকরা রোগের বিস্তার নিয়ে গবেষণা করে বলছেন "বন্য প্রাণী থেকে মানুষের মধ্যে রোগ সংক্রমণ এবং তারপর তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে পারে"। প্রাকৃতিক জগতে মানুষের অনুপ্রবেশ সেই প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করছে।

যারা সব বিধান পূঙ্খানুপূঙ্খ রূপে মেনে চলছে, তারাও তো আক্রান্ত হচ্ছে। কোন কিছুতেই করোনাকে আটকান যাচ্ছে। বয়োজ্যেষ্ঠ, ডাক্তার, শিক্ষাবিদ, আমলা, বিচারক, আর্মি, পুলিশ, মন্ত্রী, এমপি - যারা নাকি পাঁচ তারা মার্কী সাবধানতা অবলম্বন করছেন - করোনা তাদেরকেও ধরছে, মারছে, এমন কি তুলনামূলক ভাবে বেশি হারে। অন্যদিকে দরিদ্রদের খাটা খাটনি, ক্ষুধিত অবয়ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার (immunity) দুর্গ বা আধার হয়েছে। তুলনামূলক ভাবে কম হারে আক্রান্ত হচ্ছে।

এ সব দেখে শুনে অনেক বিজ্ঞানেরা এখন আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় নিয়ে বলছেন - করোনা প্রকৃতির প্রজ্ঞা ও কৌশল। প্রকৃতির লীলা খেলা। সহজ মানুষ লালন সাইজি ভাষায় 'যার মর্ম ভেদ সে যদি না কয়, কার সাধ্য তাই জানিতে পায়?'

'নিখুঁত ব্যবস্থা (perfect arrangement) করে রাখা আছে' - বিজ্ঞানীদের মুখে উচ্চারিত এ মতবাদ তো রীতিমত আধ্যাত্মিক। করোনাক্রমী অদৃশ্য প্রাকৃতিক শক্তি তার দাস রূপে সৃষ্ট মানব জাতিকে লকডাউন, সামাজিক দূরত্ব, নাক, মুখ, চোখ রক্ষা, ঘন ঘন হাত ধুয়া ইত্যাদি পদ্ধতির বেড়া জালে আটকিয়ে রেখে প্রকৃতি তার অতিমাত্রায় লুপ্তিত প্রাকৃতিক সম্পদের পুনরুদ্ধার, পুনরুজ্জীবিত করছে। করোনা মানুষের মানসিকতা পরিবর্তন করে নতুন স্বাভাবিক (New normal) নামক একটি জীবনযাপন সংস্কৃতির আগমন ও বিকিরণ নিশ্চিত করছে। মানুষ এখন করোনাক্তর নতুন পৃথিবী, New normal জীবন যাপনের চিন্তা করছে। যা টেকসই উন্নয়নে সহায়ক হবে। ভবিষ্যতে মানুষ বর্তমানের মত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে সীমা লঙ্ঘন করা থেকে বিরত থাকবে।

'সহজ মানুষ' এর প্রজ্ঞালব্ধ বোধশক্তি মতে দীর্ঘস্থায়ী লকডাউন ধ্বংসাত্মক, আর চলমান সামাজিক দূরত্ববাদ একটি অপ্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। অনেকটা মশা মারতে কামান দাগা। রবি ঠাকুরের জুতা আবিকারের গল্পের সাথেও এটা তুলনীয়। পা কে ধুলা থেকে মুক্ত থাকার জন্য জুতা বা কোন কিছু দিয়ে পা মুড়ানই যথেষ্ট। অনুরূপ ভাবে করোনা থেকে মুক্ত থাকার জন্য মুখ, নাক





ও চোখকে নিরাপদ রাখার পদ্ধতি যুক্তি সঙ্গত, কার্যকরী। এই সহজে বাস্তবায়ন পদ্ধতিটি শতভাগ কার্যকরী না করে সরকার আংশিক লকডাউন করছে বা কারফিউ দিচ্ছে, সব রকমের চলা ফেরা, কাজকর্ম, ব্যবসা বাণিজ্য, কল কারখানা, অফিস আদালত, জল, স্থল ও আকাশ পরিবহন, জনসমাবেশ, সামাজিক অনুষ্ঠান বন্ধ বা আংশিক বন্ধ রাখার পদক্ষেপ নিচ্ছে। এ এক অপরিণামদর্শী, অবাস্তব তুঘলকি কারবার!

পক্ষান্তরে সহজ মানুষতো বটেই, অন্যরাও এখন বিশ্বাস করছে যে দুরত্ববাদ এর প্রচলন চালু করাই ছিল করোনার আগমন ও বিকিরণের হেতু - সামাজিক, আর্থিক ও পরিবেশিক টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়ন যোগ্য পরিস্থিতি তৈরি করার জন্যই করোনার আগমন। চলমান সামাজিক দুরত্ব নয়, সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের অটেকসই ব্যবহার থেকে মানুষকে দূরে রাখাই মূল উদ্দেশ্য। করোনা একটি অছিলা। বৃষ্টির জন্য যেমন মেঘ অছিলা। এভাবেই প্রকৃতির উদ্দেশ্য হাসিল হচ্ছে।

বিশ্ব আজ করোনার কাছে পরাজিত। মানুষ এখন গৃহবন্দী। গতানুগতিক জীবন ধারা পাল্টে এক নতুন স্বাভাবিক জীবন যাপনে যেতে বাধ্য হচ্ছে। 'সময় এখন প্রকৃতির' - জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির এ বছরের (২০২০) স্লোগানও এটাই। মানুষের আনাগোনা কম হওয়ায় প্রকৃতি এখন সময় পাচ্ছে পুনঃগঠনের। বাস্তবেই 'সময় এখন প্রকৃতির'।

টেকসই উন্নয়ন হলো সেই উন্নয়ন যাহা প্রকৃতির স্বকীয়তা বজায় রেখে বর্তমান প্রজন্মের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মৌলিক চাহিদা পূরণার্থে প্রাকৃতিক সম্পদ অটুট রাখে।

সৃষ্টির প্রারম্ভে সাগর-মহাসাগর, নদ-নদী, খাল-বিল, বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি-মরুদ্যান, পশু-পাখি, জীব-জানোয়ার, কীটপতঙ্গ, জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ - যেখানে যা থাকা প্রয়োজন ঠিক সেভাবে 'নিখুঁত ব্যবস্থার' মাধ্যমে রেখে দেওয়া আছে। বাউল গুরু বিজয় সরকারের ভাষায়, "গড়িয়াছেন সাই এ ভুবন কি সুন্দর করিয়া যেখানে যা লাগে তাই দিয়া"। তিনি বলেন "এ পৃথিবী যেমন আছে তেমনি ঠিক রবে সুন্দর এ পৃথিবী ছেড়ে সবার চলে যেতে হবে"।

শুধু দুরত্ববাদ পালনের মাধ্যমেই এ পৃথিবী যেমন আছে তেমনি ঠিক রেখে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া সম্ভব।

'দুরত্ববাদ' বাংলার বাউল দর্শনের একটি প্রায়োগিক মতবাদ (applied concept)। বাউল দর্শনে এটাকে 'নিকটে থেকেও দূরে থাকা' (detached while attached) হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সংসারী বাউলদের জীবন যাপন অনুসরণ করলে দেখা যায় যে তারা সংসারে থেকেও বৈষয়িক লোভ লালসা, সুখ স্বাস্থ্যন্দ্য থেকে দুরত্ব বজায় রেখে চলে। খাদ্যাভ্যাসে তারা ভুড়ি ভোজ থেকে বিরত থাকে, ছোট মাছ ব্যতিরেকে জীব হত্যা করে না বা মাংস ডিম খায় না, মুখে দাঁত থাকা কালীন অর্থাৎ অতীব বৃদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত দুধ পান করে না, শরীরের সার বস্ত্র পিতৃধন ক্ষয় করে না, দুর্নীতি, মিথ্যা, জঙ্গিবাদ থেকে দূরে থাকে। সর্বোচ্চ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধারণ করে অকাল মৃত্যুকে প্রতিহত করে।

ইসলাম ধর্ম দুরত্ববাদকে 'মধ্যপস্থা' বা 'সরল পথ' হিসেবে দেখে। বিভিন্ন বিষয়ক দুরত্ববাদ আমল করার জন্য প্রজ্ঞা ভিত্তিক একাধিক বিধান আছে।

খাদ্যাভ্যাসে দুরত্ববাদ এর বিধান আছেঃ অনাবশ্যক প্রাণী জবাই বা হত্যা থেকে দূরে থাকা। 'বাঁচার জন্যে খাওয়া, খাওয়ার জন্যে বাঁচা নয়' (Eat to live, not live to eat)। 'অণু ভাতে দুন্ বল, ভরা ভাতে রসাতল' ইত্যাদি। প্রায় সব ধর্মই ক্ষুধা লাগলে খাওয়া ও ক্ষুধা থাকতে খাওয়া শেষ করতে উৎসাহিত করে। ইসলাম পাকিস্তানের তিন ভাগের এক ভাগ খাদ্য, এক ভাগ পানি ও এক ভাগ খালি রাখার বিধান দিয়েছে।

বস্ত্র ব্যবহারেও দুরত্ববাদ হচ্ছে প্রয়োজনের বেশি পোশাক আশাক না রাখা। ইরানে একটি প্রবাদ আছেঃ 'যে কনে চার চারটা পেটিকোট পরে তার অনেক কিছুই লুকানোর থাকে' (The bride who wears four petticoats has a lot to hide)। অন্য একটি প্রবাদে আছে যে, 'চেহারা দ্বারা বিচার করবেন না; একটি ধনী হৃদয় একটি দুর্বল কোটের নিচে হতে পারে' (Do not judge by appearances; a rich heart may be under a poor coat)- Gaelic Proverb। একটি রুমানিয়ান প্রবাদ আছে 'জরাজীর্ণ কোটের নিচে পাণ্ডিত্য থাকে' (Under a ragged coat lies wisdom)।

বাসস্থান বিষয়ক দুরত্ববাদ হচ্ছে প্রয়োজনের বেশি ঘর না তৈরি করা। প্রবাদ আছে যে, 'বড় বাড়ির গোলামের চেয়ে ছোট ঘরে মুক্ত মানুষ হওয়া ভাল (It is better to be a free man in a small house than a slave in a big one)। যদি আপনার হৃদয়ে জায়গা থাকে তবে আপনার বাড়িতেও জায়গা হবে (If there is room in your heart there is room in your house) - Danish Proverb.

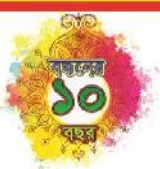
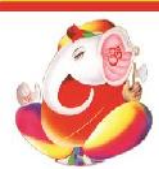
শিক্ষায় দুরত্ববাদ এর সার হলো নৈতিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা ছাড়া অন্য শিক্ষা থেকে দূরে থাকা। ইসলাম ধর্মে স্রষ্টার নিকট উপকারী জ্ঞান চাইতে বলা হয়েছে। পরীক্ষায় A+ এর চেয়ে নৈতিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার জ্ঞান আর্থসামাজিক ও পরিবেশিক টেকসই উন্নয়নে বেশী সহায়ক, উপকারী।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় দুরত্ববাদ বিষয়ে বহু বৈজ্ঞানিক বিধান আছে। সহজ মানুষ বাউলদের সহজ কথায় 'কম খাওয়া, কম ঘুমান, কম কথা বলা, শারীরিক পরিশ্রম করা।'

'করোনা ভাইরাস' প্রকৃতি সৃষ্ট একটি বার্তা সন্ত্রাস। মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রাণঘাতী না হয়েও মানুষকে সবচেয়ে বেশি কিংকর্তব্যবিমূঢ় (puzzled) করেছে, ভীতসন্ত্রস্ত করতে পেরেছে এবং সবচেয়ে বেশি শঙ্কিত করতে পেরেছে। এই শঙ্কা থেকে নিরাপদ থাকতে, টেকসই উন্নয়ন সহজীকরণার্থে সঠিক দুরত্ববাদ বিধান পালন করা দরকার, প্রকৃতিকে সময় দেয়া দরকার।

দুরত্ববাদ, বা distance-ism এর বিধানগুলি হতে পারে -

- ★ ব্যবসায়িক স্বার্থে গাছ পালা কাটা বা বন উজাড় থেকে দূরে থাকা
- ★ লোভ লালসা, হিংসা নিন্দা, পরচর্চা থেকে দূরে থাকা
- ★ প্রয়োজনের অধিক টাকা পয়সা, ধনসম্পদ অর্জন থেকে দূরে থাকা
- ★ শ্রোতৃত্বে পৌঁছার পূর্বে রাষ্ট্র রাজনীতি থেকে দূরে থাকা
- ★ সর্বপ্রকার অপচয় থেকে দূরে থাকা
- ★ অতিভোজ ও অতিউপভোগ থেকে দূরে থাকা





★ দুর্নীতিবাজদের থেকে দূরে থাকা।

সহজ সরল খাদ্যাভাস সব কিছুই মহাঔষধ। ইমিউনিটি বাড়ায়। করোনা থেকে রক্ষা পাওয়ার এইটাই সহজ টেকসই পথ।

টেকসই উন্নয়ন অর্জন সহজতর করার জন্য আমার দীক্ষা গুরু মুক্তিযুদ্ধে শহীদ (১৫ আগস্ট ১৯৭১) বাউল এম এ গফুর সরকার (জন্ম ১৯২০) রচিত কালামটি সময়োপযোগী।

”গাছে দাও কাঁটার বেড়া, নইলে খাবে ছয় ছাগলে।

চারা গাছে দেয় না বেড়া, তার লাগান যায় বিফলে।

গাছ লাগালি কস্ট করে, না দিলি তায় ঘিরে বেড়ে,

ধর্ম ষাঁড়ে নাগাল পেলে, গাছ মুরাবে ডালে মূলে।

অনুরাগ নিড়ানি দিয়া, দাও না গাছের গোড় নিড়াইয়া,

শ্রেম রসেরই সার দিবাগো চাও যদি গাছ ফুলে ফলে।

ভাগ্যফলে ফল ধরিলে, তুইল ওফল পকু হলে,

বাউল গফুর বলে

অকালেতে ফল তুলিলে পাকা ফল নাই তার কপালে।”

(সম্পাদনা – বিশ্বজিৎ বসু)

The Bangladeshi Community in Western Australia: through a Generational Lens

-Rita Afsar, PhD

This year when I got the request to write for Bandhan—the Puja magazine, I immediately thought of writing about the second-generation Bangladeshis. In the context of unprecedented uncertainty unleashed by COVID-19 and the subsequent doom and despair across the globe, my hope lies only with children and young people. As the reservoir of immense energy and courage, I strongly believe that they can change the world for a more sustainable and better future in which common good and shared prosperity will prevail overgrowth based and profit driven selfish motives. Accordingly, I have dedicated my article to them.

Definition

In a simplistic way, a second-generation migrant is often defined as “A person who was born in and is residing in a country that at least one of their parents previously entered as a migrant.”

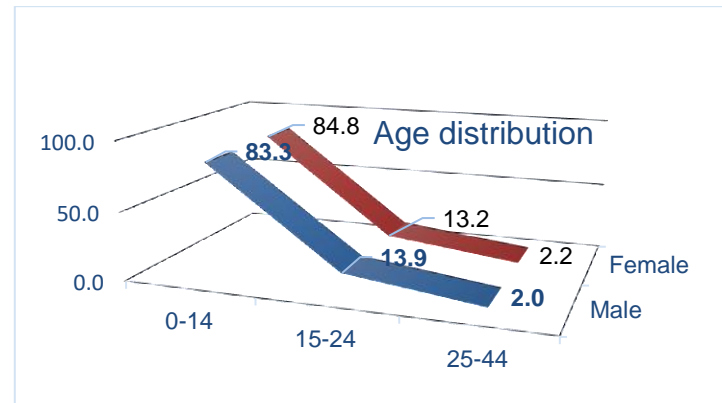
(https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/second-generation-migrant_en)

Similarly, the Australian Bureau of Statistics (ABS) defines second generation Australians as those born in Australia but had one or both parents born overseas.

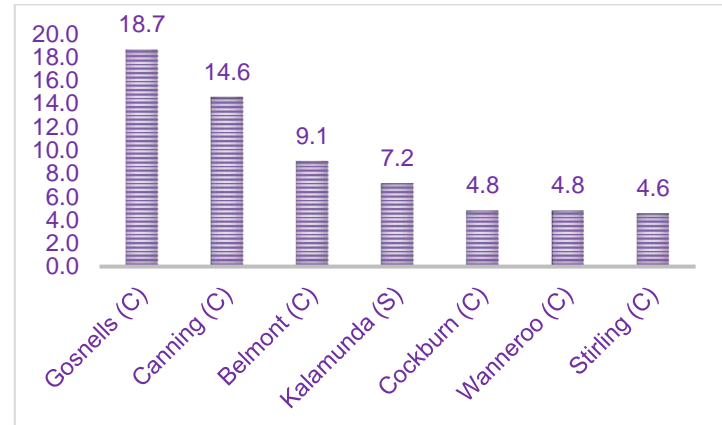
However, these definitions are not broad enough to capture experiences those children who were not born in Australia but were brought up and educated here. In order to present the Bangladeshi community through a generational lens, I used a broader definition. It includes children of Bangladeshi parents irrespective of their country of birth, who were the usual residents of WA at the time of the 2016 Population and Housing Census. The idea is to capture multidimensional experiences of children of migrants which they acquire by birth or by living in a country to which they migrated neither as the principal migrants nor were, they necessarily involved in the migration decision making process.

Demographics

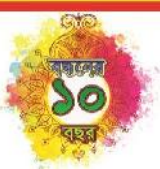
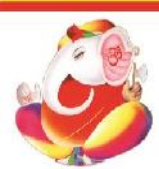
Based on the 2016 data, an estimated 1,203 second generation Bangladeshis were living in WA. Most of them were children (84%) or youth under 25 (13%).



They lived mainly in the Metropolitan Local Government areas (LGAs) of Gosnells, Canning, Belmont and Kalamunda.

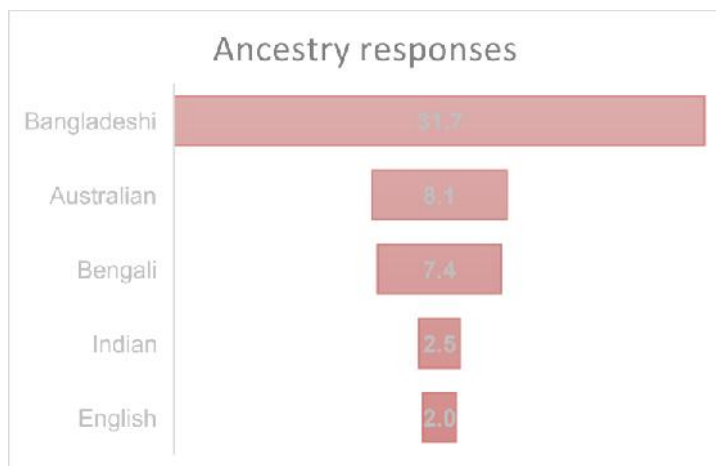


As expected, most of them were Australia born, followed by those born in Bangladesh. Small proportions were also born in New Zealand and Singapore.





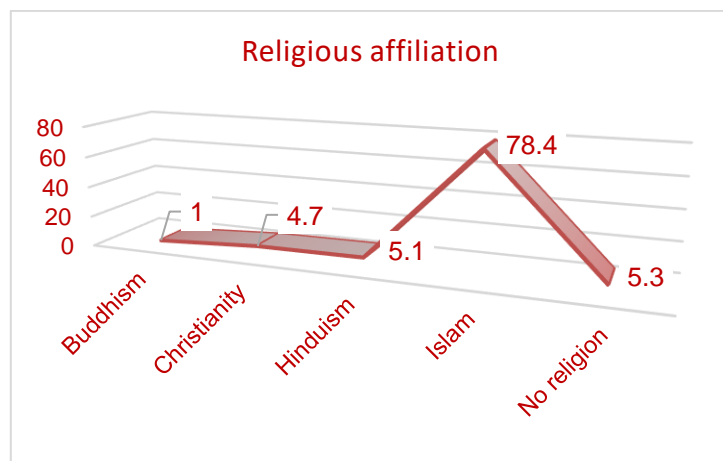
Most common ancestry responses of the second-generation Bangladeshis were Bangladeshi, Australian, Bengali, Indian and English.



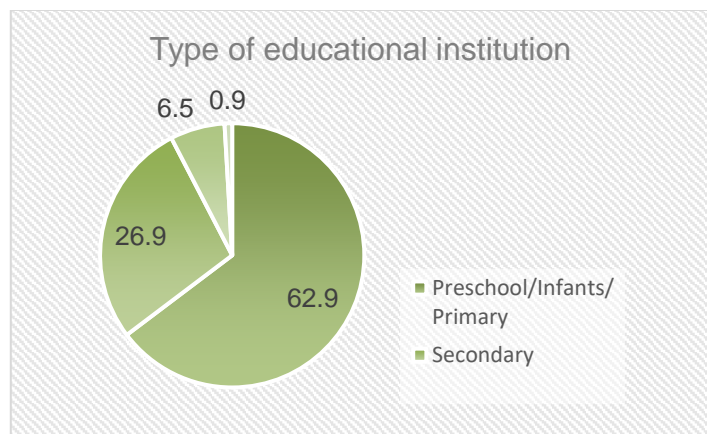
Most (two-thirds) spoke Bengali at home, while one-quarter spoke only English. This is quite encouraging, particularly for parents given that teaching mother tongue often poses a big challenge for parents settling in a new country. Although most of the second-generation Bangladeshis, who spoke language other than English at home reported speaking English very well or well (78%), yet there were 17% who identified themselves as low proficiency English speakers.

Also note, for the Australia born cohort, the proportion of Bengali speakers declined to 53%, while those who spoke English only increased to 37%.

Most of the second-generation Bangladeshis were affiliated with Islam. The remainder were almost equally divided between those with no religious affiliation or secular or other spiritual beliefs, Hinduism and Christianity.



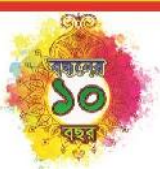
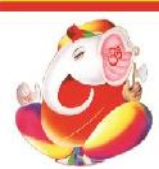
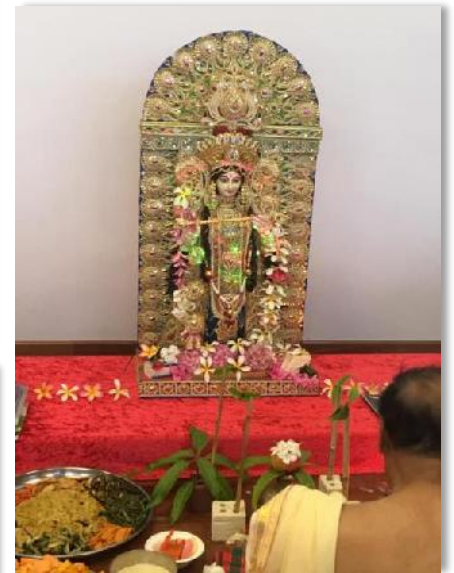
Most of them were attending primary or pre-primary schools or institutions, followed by those attending secondary schools.



Given that Bangladeshi second generation is predominantly young, bringing up children in Australia can be a dream as much as a challenge for the parents. On the one hand, studies have found that children of migrants are high achievers in terms of educational outcomes as well as economic and social integration. On the other hand, research highlights their new challenges such as identity crisis, cultural and generational clash, and the negative impact of bullying as well as other ethnic and racial discrimination. In their everyday life, the second generation often feel more Australian than their parents although they may not be perceived “really” Australian by the broader community. Time has come for courageous conversations about race and culture in educational institutions, community, and wider society. More than that, there is a clear need to reconstruct Australian identity from the perspective of second-generation Australians – from the narratives of their aspirations and dreams.













Paul Tax & Accounting Services

Individual Tax Return from \$50

- > Rental Property Tax Return*
- > Company, Partnership, Trust and SMSF Tax Return*
- > Company, Trust and SMSF set up*
- > Tax Planning > Small Business Setup*
- > GST Return > Bookkeeping Services*

Contact: 0433003415

Biplab Paul

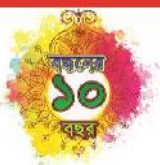
Paul Tax and Accounting Services

Registered Tax Agent and Public Accountant

Masters of Accounting (Central Queensland University)

M.Com (DU) B.Com (Hons) DU

Email: paul_biplab7@yahoo.com.au







Indoor Flooring

Artificial Lawn & Landscaping

Outdoor Decking

Paving

Planter Box

Wattle Flooring & Outdoor Living

15 % Discount for All Bangladeshi Customer

WATTLE FLOORING

Unit 2 , 48 Vinnicombe Drive

0481518111

www.wattleflooring.com.au



PERTH AUTOMOTIVE SOLUTIONS

AUTOMOTIVE MOBILE MECHANIC SERVICES: WE COME TO YOU

South of the river location (Thornlie). Booking essential.

Please call NAZRUL on **0466044766** or email to: service@pasolutions.com.au

We provide Mobile Automotive Mechanic service at your door step for your all Servicing and maintenance need for your vehicles. Perth Automotive Solutions is WA's Licensed Repairer run by qualified and industry experienced Engineers and technicians.

Our services:

- ❖ General service
- ❖ Logbook service
- ❖ Mechanical repair
- ❖ Brakes repair
- ❖ Electrical and electronics repair
- ❖ Diagnostic checks and repair
- ❖ Pre-purchase inspection
- ❖ Head Lights Restoration





Blue River Financial Services Pty Ltd

WORDS FROM OUR CLIENTS

Ted and Annette Batory

Willetton WA 6155

"We have known "Wahid Khan" for many years and during this time he has ensured our transition to retirement and eventually retirement itself has been a smooth and rewarding experience. His exceptional knowledge, helpful attitude, ability to explain clearly and take us through difficult things again if we were unsure, as well as listen carefully and respond to our concerns", means we had the upmost confidence in the planning he was doing for the both of us. We especially appreciate how Wahid always ensured we fully understood and were happy with the process before proceeding. Flexible meeting times and home visits made the whole process far more relaxing and he always made himself available for us to call at any time with concerns or questions. We will continue working with Wahid and based on our experiences, have no hesitation in recommending "Blue River Financial Services Pty Ltd" to anyone."

Our Services :

- 1. Building Superannuation Assets.**
- 2. Establishing a Home Loan that suits your individual needs (through a large range of providers).**
- 3. Self-Managed Superannuation (SMSF)**
- 4. Creating wealth through Investment planning.**
- 5. Creating a Retirement Plan tailored to your goals and objectives.**

Raj Joarder

**Master of Mechanical Engineering
Finance Manager/Director
Debt Advice Specialist
Mob: 0403 979 106
raj.joarder@ampfp.com.au**

Wahid Khan

**Master of e-business
Senior Financial Planner/
Director
Mob: 0433 221 832
wahid.khan@ampfp.com.au**

ADDRESS : 264B High Road Riverton, WA 6148

Web : <http://www.blueriverfinancial.com.au>



Blue River Financial Services Pty Ltd ABN 18136890128 and Wahid Khan are Corporate Authorised Representatives and Credit Representatives of AMP Financial Planning Pty Limited | ABN 89051208327 | Australian Financial Services Licence 232706 | Australian Credit Licence 232706

Express yourself with...

Ananyna's COLLECTION



Sarees

Salwar Suits

Kurtis

Palazzos

Men's Panjabi

Jewelry

Leather Bags



View only by Appointment.

CONTACT - Anu 0413161491

LOCATION - 9/88 Broadway
Nedlands 6009